সূর্যাস্তের আগে

সূর্যাস্তের আগে

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

কামিনী প্রকাশালয়

১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন,

কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
মাঘ—১৩৬৫

প্রচ্ছদ ঃ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীবিভাষ ঘোষ
৩৬, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সূর্যাস্তের আগে

পাহাড়টা তেমন উঁচু নয়। বড়জোর হাজার চারেক ফিট। সেটার চুড়ো বৃত্তের আকারে ঘিরে রয়েছে ক্রিশ্চান মিশনারিদের একটা চিকিৎসাকেন্দ্র। চুড়ো থেকে নিচে ঢালের দিকে দেড় কিলোমিটার জুড়ে তার বিস্তার। নাম 'লাইফলাইন ক্যানসার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার।'

এখানে যেদিকে তাকানো যাক, প্রচুর ঘন সবুজ গাছপালা। বেশির ভাগই ফুলের, রয়েছে রকমারি ফলেরও। তা ছাড়া ঝাড়ালো রেনট্রি, শিশু, দেবদারু, জারুল, লাইন দিয়ে সিলভার পাম। পুরো বাউন্ডারি ওয়ালের গা ঘেঁষে সুপারি গাছের সারি লম্বা লম্বা পায়ে ডিঙি মেরে আকাশে কী যেন দেখতে চাইছে।

গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে পেশেন্টদের জন্য টালির শেডের অগুনতি কটেজ। প্রায় শ'দেড়েক। এক-একটা কটেজে দু'জন করে রোগীর থাকার ব্যবস্থা। মূল হাসপাতাল, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ল্যাবোরেটরি, এগুলো কিন্তু বিরাট আকারের এবং প্রতিটি তেতলা। বিল্ডিংগুলোতে পুরনো ব্রিটিশ স্থাপত্যের ছাপ। সমস্ত কিছু ঝকঝকে, তকতকে। সব মিলিয়ে এক স্বপ্নের উদ্যানে এই আরোগ্য নিকেতন।

শীতটা যে এবার বেশ জাঁকিয়ে পড়বে, এখন নভেম্বর মাস শেষ হতে না হতেই তা টের পাওয়া যাচ্ছে। উত্তর দিক থেকে ধেয়ে আসছে বাতাস—শুষ্ক, জলকণাহীন, কনকনে। গায়ে লাগলে মনে হয় হাড় অব্দি বিঁধে গেল। উত্তুরে হাওয়া অদৃশ্য নকিবের মতো জানান দিচ্ছে, দুরন্ত হিমঋতু আসতে আর দেরি নেই।

এখনও ভালো করে ভোর হয়নি। সূর্যোদয় হবে আরও কিছুক্ষণ বাদে। হালকা কুয়াশা মিহি মলিদার মতো আলতো করে চরাচরকে জড়িয়ে রেখেছে। মাথার ওপর চিরকালের পরিচিত বিশাল চাঁদোয়ার মতো মহাকাশ কেমন যেন আধো-চেনা, আধো-রহস্যময়। তার গায়ে, এখানে ওখানে, দু'

চারটে ম্যাড়মেড়ে তারা চোখে পড়ে। দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো লহমায় মুছে যাবে।

হাসপাতালের কোথাও সাড়া-শব্দ নেই। চারিদিক একেবারে নিঝুম। আবাসিক রোগীদের এখনও ঘুম ভাঙেনি। তবে বেশ কিছু ক্লাস-ফোর স্টাফের কর্মী বেরিয়ে পড়েছে। সাড়ে সাতটার ভেতর হাসপাতাল চত্বর, রোগীদের কটেজ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং টিল্ডিংয়ে সাফাই চুকিয়ে ফিটফাট করে ফেলতে হবে। একটা ধুলোর কণা বা এক কুচি বাজে কাগজ কিংবা গাছ থেকে খসে-পড়া শুকনো পুরনো পাতা যেন কোথাও পড়ে না থাকে। এখানে প্রতিটি মুহূর্ত ভীষণ দামি। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সমস্ত কিছু জড়ানো। যার যা ডিউটি, সঠিক সময়ের ভেতর শেষ করতেই হবে। আসল কথা ডিসিপ্লিন--শৃঙ্খলা। শীতগ্রীষ্ম বারোমাস একটা দিনও তার হেরফের হবার উপায় নেই।

এখানে সিকিউরিটির দারুণ কড়াকড়ি। দিনরাত তিন শিফটে তীক্ষ্ণ নজরদারি চালানো হয়। রাত্তিরে যে সব সিকিউরিটি গার্ডের ডিউটি ছিল এখনও তাদের দু'চারজনকে দেখা যাচ্ছে. রাত জাগার কারণে ওদের চোখে রাজ্যের ঘুম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তারা ঢুলছে।

ক'জন গার্ড আর চতুর্থ শ্রেণির কিছু কর্মী ছাড়া এত বড় হাসপাতাল ঘুমের আরকে ডুবে আছে। মানুষের ঘুম না ভাঙলেও পাখিরা কিন্তু জেগে গেছে। ভোর হতে না হতেই গাছের মাথায় কোরাসে তাদের কলকলানি শুরু হয়েছে। কত রকমের যে পাখি! চড়াই, বুনো টিয়া, দুর্গা টুনটুনি, ঝুঁটিদার বুলবুলি, ছাতারে, এমনি কত কী। চেঁচামেচির সঙ্গে চলছে ডানা ঝাপটানি।

পাখিদের হাঁকডাক, কলরবলর ছাড়া সমস্ত এলাকা জুড়ে অপার প্রশান্তি। তীব্র হইচই, স্লোগান, মিছিল, অজস্র যানবাহনের কানফাটানো আওয়াজ, দম-আটকানো ভিড়, সারাক্ষণ উত্তেজনা, সারাক্ষণ টেনশন, এসব মিলিয়ে যে পরিচিত, সশব্দ সদাব্যস্ত পৃথিবী, এই হাসপাতাল তার লক্ষ কোটি মাইল দূরে যেন এক পরমাশ্চর্য গ্রহ—শান্ত, মায়াময়, অফুরান স্নিগ্ধতায় ভরা।

অন্য রোগীরা ঘুমিয়ে থাকলেও তিনজন কিন্তু এর মধ্যেই তাঁদের কটেজ থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। ওঁদের দিকে এবার তাকানো যেতে পারে। এঁরা হলেন কর্নেল দিবাকর লাহিড়ি, মণিময় সরকার এবং শুভেন্দু বসু।

দিবাকর লাহিড়ির বয়স তেষট্টি, মণিময়ের চুয়ান্ন, শুভেন্দুর সাতাশ। অসমবয়সী তিনটি মানুষের স্বভাবে, ধ্যানধারণায় অনেকখানি মিল। তাঁরা ক্যানসারের পেশেন্ট। দিবাকর এবং মণিময় এই হাসপাতালে মাস আটেক ধরে আছেন। শুভেন্দু অতদিন নয়, চারমাস হল এসেছে।

তিনজন দিনের অনেকটা সময় এক সঙ্গে কাটান। আরম্ভ হয় প্রাতঃভ্রমণ দিয়ে। অন্যদিন তাঁরা একটু দেরি করেই সকালে বেড়াতে বেরোন। সূর্য তখন দিগন্তের তলা থেকে উঁকি ঝুঁকি দিতে শুরু করে। আজ তিন ভ্রমণসঙ্গী অনেক আগেই বেরিয়ে এসেছেন।

তিনজনেরই পরনে শার্ট ট্রাউজার্সের ওপর গরম চাদর। সবার হাতেই মাঝারি মাপের ট্র্যাভেল ব্যাগ। সেগুলোতে রয়েছে তিন চারদিনের মতো পোশাক আশাক এবং নানা টুকিটাকি দরকারী জিনিস—শেভিং বক্স, ঘরে পরার চটি, তোয়ালে এবং রাস্তায় খাওয়ার জন্য পাউরুটি, বিস্কুটের প্যাকেট, মাখন, চিজ, দুধের পাউচ, একটা করে টর্চ, কাগজ কলম ইত্যাদি। তা ছাড়া, ব্যাঙ্কের চেক-বই। আজকাল নতুন সিস্টেমে বড় ব্যাঙ্কে যাদের অ্যাকাউন্ট আছে তারা দেশের যে কোনও ব্রাঞ্চ থেকে টাকা তুলতে পারে। হঠাৎ যদি তেমন দরকার হয় তাই চেক-বই সঙ্গে নিয়েছেন দিবাকররা।

ব্যাগগুলো চাদর দিয়ে এমন ভাবে ঢাকা, বাইরে থেকে তা দেখার উপায় নেই। তবে কর্নেল লাহিড়ির ব্যাগসুদ্ধ একটা হাত চাদরের তলায় লুকনো থাকলেও অন্য হাতটায় রয়েছে মোটা বেতের, লোহার মুঠ-লাগানো একটা মজবুত ছড়ি। সেটা অবশ্য দেখা যাচ্ছে। এই হাসপাতালের সবাই জানে, বাইরে বেরুলে ছড়িটা তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। না, তিনি অশক্ত পঙ্গু-টঙ্গু নন, শরীরে কোনও খুঁত টুঁতও নেই। ওটা হাতে থাকলে তিনি অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ছড়ি হাতে বেড়ানোটা তাঁর অভ্যাসের একটা অংশ হয়ে গেছে।

দিবাকররা এদিকে সেদিকে তাকাতে তাকাতে চুপিসারে হাসপাতালের মেইন গেটের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁরা যে আজ এত ভোরে উঠেছেন তার

কারণও আছে। এই সময়টা পাহারাদারি বেশ ঢিলেঢালা থাকে। সারা রাত চোখ টান করে ডিউটি দেবার পর সিকিউরিটি গার্ডদের অন্যের গতিবিধির ওপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নজর রাখার মতো তেমন এনার্জি আর টিকে থাকে না।

কিন্তু দিবাকরদের থমকে যেতে হল। কেননা ঠিক গেটের মুখে একজন সিকিউরিটি গার্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলছিল। খুব সম্ভব তার জায়গায় যে ডিউটি দেবে, এখনও সে এসে পৌঁছয়নি। যতই গার্ডটার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসুক, যতই এনার্জি ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাক, তার সামনে দিয়ে কেউ বেরিয়ে যাবে সেটা কিছুতেই সে হতে দেবে না।

দিবাকর চাপা গলায় বললেন, 'কী মুশকিল, ওখানে একটা গার্ড রয়েছে। গেটের কাছে এখন যাওয়া ঠিক হবে না। বাঁ দিকটায় চল। তারপর তাক বুঝে বেরুনো যাবে।'

বাঁ পাশে গাছপালার ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে সুরকির পথ। তিনজন সেখানে গিয়ে চক্কর দিতে দিতে নজর রাখতে লাগলেন। একসময় চোখে পড়ল গার্ডটা কী যেন দেখার জন্য গেট থেকে খানিকটা দূরে সরে গেছে।

দিবাকর ব্যস্তভাবে বললেন, 'শুভেন্দু, এই সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে। তুমি আগে বেরিয়ে যাও—'

নিঃশব্দে পা টিপে টিপে গেট পেরিয়ে চলে গেল শুভেন্দু। তারপর চোখের ইশারায় মণিময়কে যেতে বললেন দিবাকর। মণিময়ও বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু দিবাকর নিজে যখন বেরুতে যাবেন, গার্ডটা ততক্ষণে ফিরে এসেছে। লহমায় তার ঢুলুনি ছুটে গেল। শশব্যস্ত, শঙ্কিত ভঙ্গিতে সে বলে, 'এ কী, কোথায় যাচ্ছেন কর্নেল স্যার?'

হাসপাতালের ডিরেক্টর বা সুপারিনটেন্ডেন্টের অনুমতি ছাড়া কোনও পেশেন্ট কমপাউন্ডের বাইরে যেতে পারে না। দিবাকর গার্ডটির কাঁধে ছড়িসুদ্ধ হাতটা রেখে মিষ্টি হেসে বললেন, 'সুপার ডাক্তার স্মিথের পারমিশন নিয়েছি। তোমার চিন্তার কারণ নেই।'

মুখে বললেই হয় না, লিখিত অনুমতি-পত্র চাই এবং সেটা গেটের সিকিউরিটি গার্ডের কাছে জমা দিতে হয়। কিন্তু কর্নেল লাহিড়ির ব্যক্তিত্ব

এতটাই প্রবল, গার্ডটা তা চাইতেই পারল না। ঢোক গিলে মিনমিনে গলায় জিগ্যেস করল, 'কখন ফিরবেন স্যার?'

পারতপক্ষে মিথ্যে বলেন না দিবাকর। ভেতরে ভেতরে একটা ঝাঁকি লাগল তাঁর কিন্তু বাইরে তা ফুটে বেরুতে দিলেন না। চোখমুখ যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললেন, 'বড় জোর দু'তিন ঘণ্টা। ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট করব।'

'ঠিক আছে স্যার—'

দিবাকর আর দাঁড়ালেন না, বাইরে চলে গেলেন। বেশি কথা বললে ঠিক ধরা পড়ে যাবেন। একটানা মিথ্যে চালিয়ে যাওয়া তাঁর ধাতে নেই। ফস করে সত্যিটা বেরিয়ে আসবে।

গেটের বাইরে খানিকটা জায়গা সমতল। তারপর পাহাড়ি রাস্তা দু'ভাগ হয়ে ঢাল বেয়ে দু'দিকে নেমে গেছে। দিবাকর ডান পাশের রাস্তাটা দিয়ে এগিয়ে চললেন। অনেকটা নামার পর দেখা গেল একটা বিশাল রেনট্রির তলায় নীল রঙের একটা অ্যামবাসাডরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন মণিময় আর শুভেন্দু। মাঝে মাঝেই তাঁরা ওপর দিকে, রাস্তাটা যে ধার দিয়ে নেমে এসেছে সেদিকে তাকাচ্ছেন। দিবাকরের আসতে কেন দেরি হচ্ছে সেজন্য তাঁরা খানিকটা চিন্তিত, হয়তো একটু উদ্বিগ্নও। গাড়ির ড্রাইভার ওঁদের কাছাকাছিই রয়েছে। দিবাকর সোজা সেখানে চলে এলেন।

এই রেনট্রিটা হাসপাতাল থেকে প্রায় পাঁচশো ফিট নিচে; একটা বাঁকের আড়ালে। অনেকটা উচ্চতা থেকে হাসপাতালের সিকিউরিটি গার্ড বা অন্য কারও পক্ষে দিবাকরদের দেখা সম্ভব নয়।

পাহাড়ের মাথায় হাসপাতাল। একেবারে তলায় মাঝারি মাপের জমজমাট এক শহর—সোনাডিহি। সেখানকার এক বড় গ্যারাজের মালিক হরনাম সিং গাড়ি ভাড়া দেয়। নানা ধরনের গাড়ি—মারুতি, বোলেরো, অ্যামবাসাডর, টাটা সুমো ইত্যাদি ইত্যাদি। সবই 'রেন্ট আ কার' সিস্টেমে।

'লাইফ লাইন ক্যানসার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার'-এর নিজস্ব অনেক গাড়ি আছে। প্রায় ডজন দুই। আছে অ্যাম্বুলেন্স, জিপ, ভ্যান, ছোট ট্রাক ইত্যাদি। তবু মাঝে মাঝেই হরনাম সিংয়ের গ্যারাজ থেকে এদের গাড়ি

ভাড়া নিতে হয়। যে-সব ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসে তাদের একজনের কাছ থেকে দিবাকর হরনামের গ্যারাজের ফোন নাম্বার জেনে নিয়ে টুকে রেখেছিলেন ডায়েরিতে।

সপ্তাহখানেক আগে হরনামকে হাসপাতালে ডাকিয়ে এনে পাঁচদিনের জন্য নীল অ্যামবাসাডরটা ভাড়া নিয়েছেন দিবাকররা। তাকে বলা হয়েছিল আজ ভোরে এখন গাড়িটা যেখানে রয়েছে সেখানে এনে যেন ওটা রাখা হয়। বার বার তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে চালক গাড়ি নিয়ে আসবে সে যেন ভুল করে সোজা হাসপাতালে চলে না যায়। এটা ভীষণ জরুরি। দিবাকররা ঠিক সময়ে রেনট্রির তলায় চলে আসবেন। যদি ড্রাইভার হাসপাতালে গিয়ে হাজির হয় তক্ষুনি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। হরনাম সিং এমন উদ্ভট ব্যবস্থায় অবাক হলেও রাজি হয়েছিল।

দিবাকরদের আরও একটা শর্ত ছিল। ড্রাইভার গাড়ির চাবি তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে চলে যাবে। তাঁরা নিজেরাই চালাবেন এবং পাঁচ দিন বাদে গাড়িটা হরনামকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। গাড়ি যদি কোনও অ্যাকসিডেন্টে পড়ে তার সমস্ত ক্ষতিপূরণ দেবেন দিবাকররা।

হরনাম এবার বেঁকে বসেছিল। ক্ষতিপূরণ টুরণ ঠিক আছে কিন্তু নিজের ড্রাইভার ছাড়া গাড়ি ছাড়তে রাজি হচ্ছিল না সে। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত এক লাখ টাকা সিকিউরিটি হিসেবে জমা রেখে তাকে হেলানো গেছে। সেই সঙ্গে হরনামকে অনুরোধ করা হয়েছিল, দিবাকররা যে গাড়ি ভাড়া নিচ্ছেন, ঘুণাক্ষরেও হাসপাতালের কেউ যেন জানতে না পারে। কেন অন্য কারওকে আপাতত জানানো হবে না তা নিয়ে হরনাম যেন কোনও প্রশ্ন না করে। ফিরে এসে তাঁরা তাকে সব বুঝিয়ে দেবেন। হরনামের মনে কৌতূহল যে চাড়া দিয়ে ওঠে নি তা নয়। তবে সে ঝানু বিজনেসম্যান। খোঁচাখুঁচি করে পয়সাওলা কাস্টোমারের মেজাজ বিগড়ে না দিয়ে তার কথামতো চললে আখেরে যে লাভ হয় সেটা না বোঝার মতো গবেট সে নয়। হরনাম এ ব্যাপারে মুখ বুজে থেকেছে। কিছু জানতে চায়নি।

যাই হোক দিবাকরকে দেখে উৎকণ্ঠা কেটে যায় মণিময়দের। মণিময় জিগ্যেস করেন, 'কী ব্যাপার দিবাকরদা, আপনার এত দেরি হল যে? আমাদের চিন্তা হচ্ছিল—'

দিবাকর বললেন, 'আর বোলো না, তোমরা তো স্মুদলি বেরিয়ে এলে। আমি যেই লক্ষ্মণরেখা পেরুতে যাব, ব্যাটা গার্ডটা মাঠি ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে আমার পালস রেট বেড়ে গেল। টের পেলাম হার্টটা ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছে—'

'তারপর?'

'তারপর আর কী। মিথ্যে বলার তো হ্যাবিট নেই। কিন্তু নিরুপায়। ছোকরাকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে বেরিয়ে এলাম। এখন এসব থাক, হরনাম সিংয়ের ড্রাইভারটাকে আগে বিদেয় করি। তোমরা ওর কাছ থেকে গাড়ির চাবি নিয়েছ?'

শুভেন্দু বলল, 'না। আপনার জন্যে ওয়েট করছিলাম।'

গলার স্বর সামান্য উঁচুতে তুলে দিবাকর ড্রইভারকে ডাকলেন, 'ইধর আও—' ড্রাইভার কাছে এলে বললেন, 'চাবি দো—'

ড্রাইভার নিঃশব্দে পকেট থেকে চাবি বার করে দিলে দিবাকর তাকে পঞ্চাশ টাকার একখানা নোট দিয়ে বললেন, 'অব যাও—'

সূর্যের আলো ফুটতে না ফুটতেই নগদ পঞ্চাশটা টাকা বকশিশ পেয়ে ড্রাইভার যতটা অবাক, তার চেয়ে অনেক বেশি ডগমগ। লম্বা স্যালুট হাঁকিয়ে একমুখ হেসে সে নিচের রাস্তা ধরল।

খানিক আগে কুয়াশার যে ফিনফিনে মলিদাটা দিগন্ত অব্দি লেপ্টে ছিল সেটা দ্রুত ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। অনেক, অনেক দূরে মস্ত লাল টুকটুকে অলৌকিক গোলকের মতো সূর্যের আধাআধি উঠে এসেছে। সমস্ত চরাচরে অদৃশ্য ব্রাশ চালিয়ে কেউ যেন লালচে ছোপ ধরিয়ে দিচ্ছে।

দিবাকর বললেন, 'এসো, গাড়িতে উঠে পড়া যাক। ফ্রন্ট সিটেই আমরা তিনজন বসব। ব্যাগট্যাগ থাকবে ব্যাক সিটে। আমাদের সবারই ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। একজন টায়ার্ড হলে আরেকজন চালাবে। শুরুটা করব আমি। এসো—'

তিনজন উঠে পড়লেন। দিবাকর স্টিয়ারিং ধরে বসলেন। তাঁর ঠিক পাশেই মণিময়। মণিময়ের পর জানালার ধারে ঘেঁষে শুভেন্দু। তাঁদের মালপত্র ডাঁই হয়ে রইল পেছনের সিটে।

দিবাকর স্টার্ট দিলেন। পাহাড়ি রাস্তা খাড়া নিচে নামে না; পাহাড় ঘিরে পাক খেতে খেতে তলার দিকে চলে যায়। তাড়াহুড়ো নেই, দিবাকররা পাকদণ্ডী বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে লাগলেন।

মণিময় জিগ্যেস করলেন, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি দাদা?' শুভেন্দু এবং তিনি দিবাকরকে দাদা বলেন। দিবাকর ওঁদের নাম ধরে ডাকেন, তুমি করে বলেন।

দিবাকর বেজায় বেসুরো, বেজায় মোটা গলায় দারুণ খুশির মেজাজে এক লাইন গেয়ে উঠলেন, 'সকল বাঁধন ছিঁড়ে মোরা হয়েছি স্বাধীন—' তারপর বললেন, 'হাতপায়ের ডান্ডাবেড়ি ভেঙে বেরিয়ে পড়েছি। তোমাদের তো আগেই বলেছি, এই পাঁচটা দিন কোনও নিয়মের তোয়াক্কা করব না। আমাদের ডেফিনিট কোনও ডেস্টিনেশন নেই। যখন যেদিক ইচ্ছে, যেদিকে খুশি চলে যাব।'

দিবাকরের দুই সঙ্গী তক্ষুনি সায় দিলেন। —'রাইট'।

দুই

যে খাপছাড়া, আজব তিনটি মানুষ নিয়মভাঙা, বেপরোয়া, পরমাশ্চর্য এক সফরে বেরিয়ে পড়েছেন, গোড়াতেই তাঁদের সম্বন্ধে সবিস্তারে জানিয়ে দেওয়া যাক। এই কাহিনির ধরতাইয়ের জন্য সেটা খুবই জরুরি।

কর্নেল দিবাকর লাহিড়ি

দিবাকরদের আদি বাড়ি ছিল অখণ্ড বাংলার পাবনা ডিস্ট্রিক্টে (এখনকার বাংলাদেশ)। তিন জেনারেশন আগে তাঁর ঠাকুরদা আদিনাথ লাহিড়ি কলকাতায় চলে আসেন। মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে থেকে ল' পড়তেন। দারুণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। রেজাল্ট হয়েছিল চোখধাঁধানো। ল'কলেজ থেকে বেরিয়ে হাইকোর্টের এক ব্যারিস্টারের কাছে বছর তিনেক জুনিয়র হিসেবে কাটিয়ে নিজেই স্বাধীন প্র্যাকটিস শুরু করেন। অল্পদিনের ভেতরেই পসার জমে যায়। দুর্দান্ত ল'ইয়ার হিসেবে হাইকোর্ট পাড়ায় তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।

পসার জমার পর গড়পারে বিশাল তেতলা বাড়ি তৈরি করে পাবনা থেকে গোটা পরিবার নিয়ে আসেন আদিনাথ। দেশের সঙ্গে সব সম্পর্ক ধীরে ধীরে চুকেবুকে যায়। কলকাতা হয়ে ওঠে তাঁদের দ্বিতীয় স্বদেশ।

ঠাকুরদার একটিই ছেলে। তিনি সত্যদেব—দিবাকরের বাবা। সত্যদেবও ছিলেন নাম-করা অ্যাডভোকেট। অজস্র মক্কেল তাঁর; দু' হাতে অঢেল পয়সা রোজগার করেছেন।

দিবাকরও ছিলেন মা-বাবার একমাত্র সন্তান। বাপ-ঠাকুরদা হাইকোর্টের দিকে যে সোনাবাঁধানো রাস্তাটা তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনি কিন্তু সে পথে হাঁটেননি। আইনের রাস্তায় গেলে আদিনাথ এবং সত্যদেবের পসারটা তাঁর হাতেই চলে আসত। আর্থ, সাফল্য, প্রতিষ্ঠা, এসব লহমায় পেয়ে যেতেন। কিন্তু দিবাকর ছিলেন খানিকটা বংশধারা বিরোধী। আইনের দিকে না গিয়ে তিনি সটান চলে গেলেন ইন্ডিয়ান আর্মিতে। এই নিয়ে বাড়িতে তুলকালাম

কাণ্ড ঘটিয়েছেন বাবা আর ঠাকুরদা। হঠকারী, উন্মাদ, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথাব্যথা নেই, ইত্যাকার নানা বাক্যবাণে ওঁরা তাঁকে বিঁধেছেন কিন্তু বরাবরই দিবাকর একগুঁয়ে। একবার যা ঠিক করেন সেখান থেকে তাঁকে টলানো অসম্ভব।

বেশ কিছুদিন হাড়ভাঙা ট্রেনিংয়ের পর দিবাকরের পোস্টিং হল সাদার্ন কামান্ডে। তামিলনাড়ুতেই বেশির ভাগ সময়টা কেটেছে। মাঝে মাঝে যেতে হত কেরালা এবং কর্নাটকে।

দিবাকরের বয়স যখন সাতাশ, ঠাকুরদা তাঁর বিয়ে দেন। স্ত্রী সুজাতা এক পরমাশ্চর্য মানুষ। অনেকটা শান্ত হ্রদের মতো, বাইরে থেকে তলকূল পাওয়া ভার। সারাক্ষণই প্রায় চুপচাপ, ধীর, স্থির। কখনও উঁচু গলায় কথা বলতেন না, পৃথিবীর কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল না। মুখে নিঃশব্দ, স্নিগ্ধ একটি হাসি লেগে থাকত। তিনি যে বাড়িতে আছেন, টের পাওয়া যেত না। মনে হতো একটা ছায়াশরীর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিয়ের পর ঠাকুরদা সুজাতাকে দিবাকরের কাছে তাঁর আর্মি কোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দিবাকরের স্বভাব ছিল স্ত্রীর একেবারে উলটো। ডিউটির সময়টা বাদ দিলে হইচই, হুল্লোড়, বন্ধুবান্ধব, পার্টি, ক্লাব, প্রচুর মদ্যপান, এসব ছিল তাঁর দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যে। অন্য সমস্ত অফিসারদের স্ত্রীদের মতো দিবাকরও সুজাতাকে হুল্লোড়বাজিতে টানতে চেয়েছিলেন. পারেননি। শান্ত, নরম মানুষটির মধ্যে অনড় এক দৃঢ়তা ছিল। মৃদু গলায় তিনি বলতেন, 'এসব আমার ভালো লাগে না।'

দিবাকর অনেক বুঝিয়েছেন, সেনাবাহিনীতে এগুলো হল দস্তুর। অন্য অফিসারদের স্ত্রীরাও তো পার্টি-টার্টিতে যাচ্ছে। এতে বাধাটা কোথায়? আসলে নিজের ছাঁচে ফেলে স্ত্রীকে নিজের মনের মতো তৈরি করে নিতে চেয়েছিলেন দিবাকর। কিন্তু নিপাট মধ্যবিত্ত, সদ্‌গুরু আশ্রমে দীক্ষিত স্কুলমাস্টারের মেয়ে সুজাতার মধ্যে সেকেলে অনেক ধ্যানধারণা হাড়ে-মাজ্জায় শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছিল। সেগুলো উপড়ে ফেলা অসম্ভব। মদ্যপান ছিল তাঁর কাছে ট্যাবু। পার্টি টার্টিতে গিয়ে উদ্দাম হুল্লোড় করার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। আর দশটা সাধারণ বাঙালি মেয়ের মতো স্বামী-সন্তান নিয়ে ঘর-সংসার করবেন, সেটাই তাঁর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তাঁর

স্বপ্নের সীমা এই পর্যন্তই। এর বাইরে কোনও কিছু সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল না।

দিবাকর গোড়ার দিকে বুঝিয়েছেন। পরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। রাগারাগি, তর্জন গর্জন, চরম অশান্তি। বাড়ি তোলপাড় করে ফেলেছেন তিনি। চড়া গলায় পালটা চেঁচামেচি করেননি সুজাতা। তীব্র, কটু ভাষায় ঝগড়াঝাঁটিও করেননি। বড় বড় চোখ মেলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকেছেন পলকহীন। একসময় উত্তেজনাশূন্য, শান্ত মুখে শুধু জানিয়ে দিয়েছেন, ফৌজি ডিউটির বাইরে স্বামীর এই মাত্রাছাড়া, বল্গাহীন জীবনযাপন পদ্ধতি তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়।

সুজাতা নিজেই ঠিক করে নিয়েছিলেন, বছরের এক দেড় মাস তিনি স্বামীর কর্মস্থলে থাকবেন। বাকি মাসগুলো গড়পারের বাড়িতে শ্বশুর শাশুড়ি দাদাশ্বশুর দিদি শাশুড়ির কাছে কাটাবেন। শ্বশুর শাশুড়িরা প্রচুর বুঝিয়েছেন, বিয়ের পর স্বামীর কাছে থাকাটাই নিয়ম। সুজাতা খুবই বাধ্য মেয়ে। বয়স্কদের, বিশেষ করে যাঁরা গুরুজন, তাঁদের মুখের ওপর কথা বলতেন না। তাঁদের পরামর্শ বা নির্দেশ মাথা নিচু করে মেনে নিতেন। কিন্তু এই ব্যাপারটায় তাঁর মনোভাব ছিল খুবই স্পষ্ট। নিজের সিদ্ধান্ত থেকে তাঁকে একচুলও নড়ানো যায়নি।

দিবাকরের কাছে বছরের অল্প কিছুদিন কাটিয়ে সুজাতা দাম্পত্য জীবনটা টিকিয়ে রেখেছেন। আর বেশির ভাগ সময়টা গড়পারে থেকে স্বামীকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, যা তাঁর অপছন্দ সেটা তাঁকে দিয়ে কোনওভাবেই করানো যাবে না।

দিবাকরের বয়স যখন তিরিশ সেই সময় তাঁর মেয়ে তিথির জন্ম। তিথি জন্মাবার পর চিকিৎসার গোলমালে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন সুজাতা। কয়েক মাস তাঁকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়। শরীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল। বাকি জীবনে তিনি আর পুরোপুরি সুস্থ হননি।

আগে আগে স্বামীর কাছে এক-দেড় মাস থেকে আসতেন সুজাতা। কিন্তু মেয়ের জন্মের পর আর যাওয়া হয়নি। গড়পারের বাড়িতে গণ্ডা গণ্ডা চাকর বাকর। আলাদা রান্নার লোক। সংসারের কোনও কাজকর্মই তাঁকে করতে হতো না। তবে মেয়ের সমস্ত কিছুই নিজের হাতে করতেন। স্নান করানো,

খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো—যত্নের শেষ ছিল না। এই ভাবেই সারাটা দিন কেটে যেত তাঁর।

সুজাতা না গেলেও ছুটিছাটায় তো বটেই, নানারকম ছুতোনাতা করে অন্য সময়ও বাড়ি আসতেন দিবাকর। মেয়ের টান তো ছিলই, পুরো সুস্থ না-হওয়া স্ত্রীর জন্যও। সেটা অবশ্য মুখ ফুটে স্বীকার করতেন না। সবাই ভাবত তিথিই তাঁকে সুদূর দক্ষিণ ভারত থেকে টেনে এনেছে। তবে দিবাকর জানতেন, সুজাতাকে নিজের মতো তৈরি করে নিতে পারেননি, সেজন্য যে ক্ষোভ এবং ক্রোধটা জমা হয়ে ছিল তার ঝাঁঝ কমে আসছিল।

সময় কাটাছিল নিজের নিয়মে, নিজের গতিতে। তিথি খানিকটা বড় হবার পর ব্যস্ততা আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায় সুজাতার। তাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া, পড়া তৈরি করে দেওয়া, হোম টাস্ক করানো, পেরেন্ট-টিচার মিটিং অ্যাটেন্ড করা—একটা বাচ্চাকে মানুষ করা কি মুখের কথা! প্রায় সারাটা দিন তার পেছনে কেটে যেত।

তিথি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ছে, জাগতিক নিয়মেই জমজমাট লাহিড়ি পরিবারে ভাঙন শুরু হল। ধীরে ধীরে মানুষজন কমতে লাগল। সবার আগে চলে গেলেন ঠাকুরদা, অর্থাৎ আদিনাথ লাহিড়ি। বয়স হয়েছিল সাতাশি। চোরাবানের মতো অনেক আগেই শরীরে নানা রোগ ঢুকে গিয়েছিল। ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার, কিডনির সমস্যা, ইউরিক অ্যাসিড এমনি কত যে তার লেখাজোখা নেই। সারা জীবন পেনাল কোডের ঢাউস ঢাউস ভলিউম, চেম্বারে মক্কেলদের গিজগিজে ভিড়, আদালত, মামলা, এসব নিয়েই কেটে গেছে। শরীর আর মস্তিষ্ক আর কত চাপ নিতে পারে? ভেতরের কলকব্জা নড়বড়ে, বিকল হয়ে গিয়েছিল। মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুটা ঘটল।

ঠাকুরদার মৃত্যুর বছর তিনেক বাদে মারা গেলেন ঠাকুমা—স্বর্ণময়ী লাহিড়ি। স্ট্রোকে একটা দিক পড়ে যায়—পক্ষাঘাত। এই অবস্থায় দু'টো বছর বিছানায় কাটাতে হয়। পরে বেডসোর হয়ে গিয়েছিল। শেষ একটা মাস আচ্ছন্ন ছিলেন কোমায়। বুকের ভেতর প্রাণটা শুধু ধুকপুক করত। বোধবুদ্ধি অনুভূতি সমস্ত অসাড়। চারিদিকের পৃথিবী তাঁর বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

একদিন ধুকপুকুনিটাও থেমে গেল চিরকালের মতো। অনন্ত ভোগান্তি থেকে অবশেষে পরিত্রাণ।

তিথি যে বছর হায়ার সেকেন্ডারি দেবে সে বার মৃত্যু হল দিবাকরের বাবা সত্যদেব লাহিড়ির। তাঁরও মৃত্যু হার্ট অ্যাটাকে। কারওকে একদিনের জন্যও কষ্ট দেননি, নিজেও লেশমাত্র কষ্ট ভোগ করেননি। অ্যাটাকের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা নেমে এসেছিল।

এরপর অনেকদিন লাহিড়ি পরিবারে মৃত্যু হানা দেয়নি। তবে তিথি যেবার বি. এসসি পাস করে পুনেতে মাইক্রো বায়োলজি পড়তে গেল, দিবাকরের মা অনুপমা লাহিড়ি মাত্র সাতদিনের জ্বরে চলে গেলেন। মাত্র কয়েকটা বছরের ভেতর লাহিড়ি বংশের দু দু'টো জেনারেশন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বাকি রইলেন শুধু তিনজন। দিবাকর, সুজাতা এবং তিথি। ভারতবর্ষের তিন প্রান্তে তখন তাঁরা ছড়িয়ে আছেন। একজন তামিলনাড়ুতে, একজন পুনেতে, তৃতীয়জন কলকাতায়। ধারাবাহিক মৃত্যু গড়পারের বাড়িটা ফাঁকা করে দিয়েছিল। কয়েকটা মাত্র কাজের লোক নিয়ে বিশাল, জনশূন্য ইমারত আগলে পড়ে রইলেন সুজাতা। তিথির জন্মের পর শরীর যে ভেঙে গিয়েছিল তা আর জোড়া লাগেনি। বয়স যত বাড়ছিল, টের পাচ্ছিলেন, ভেতরটা ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। শ্বশুর-শাশুড়িরা মারা গেলেন। মেয়ে থাকে আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরে, স্বামীও তাই। সমস্ত দিন কিছু করার নেই, কথা বলার মতো তেমন কেউ নেই। নিঃসঙ্গ জীবন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

এম. এসসি পাস করে রিসার্চ করতে করতে নিজের পছন্দমতো একটি ছেলেকে বিয়ে করল তিথি। ছেলেটি মারাঠি—সঞ্জয় কানিতকার। দু'জনে একসঙ্গে পড়ত। খুবই ভালো ছাত্র। মানুষ হিসেবেও চমৎকার। ভদ্র, বিনয়ী। পুনের বিরাট অভিজাত পরিবারের একমাত্র সন্তান।

বিয়েটা অবশ্য গড়পারের বাড়িতেই হয়েছিল। তামিলনাড়ু থেকে চলে এসেছিলেন দিবাকর। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশীদের ভিড়ে, ফোয়ারার মতো উচ্ছ্বসিত হাসিতে, লঘু ঠাট্টায় গানে, ঝাঁক ঝাঁক উলুধ্বনি আর সানাইয়ের সুরে বহুকাল বাদে গড়পারের নিঝুম বাড়িটা উৎসবে মেতে

উঠেছিল। কিন্তু ক'দিন আর? সপ্তাহখানেকও নয়। তারপর তিথি আর সঞ্জয় চলে গেল পুনেতে, দিবাকর তাঁর কর্মস্থলে—দক্ষিণ ভারতে। ক্ষণিক মুখর হয়ে ওঠার পর ফের অপার নৈঃশব্দ্যে তলিয়ে গেল গড়পারের বাড়ি।

বিয়ের পর দু'চার মাস বাদে বাদে তিথি মায়ের কাছে আসত। তখনও তাদের রিসার্চ চলছে। গবেষণা শেষ হলে সে আর সঞ্জয় দু'জনেই পিএইচ ডি হয়ে অধ্যাপনার কাজ পেয়ে যায়। ক্রমশ তাদের ব্যস্ততা বাড়তে থাকে। সপ্তাহে কুড়িটা করে ক্লাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য নোট তৈরি করা, নিজেদের পড়াশোনা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে দেশ বিদেশের নাম-করা সায়েন্স ম্যাগাজিনগুলোতে পাঠানো। সারাক্ষণ কাজ আর কাজ। এক মুহূর্তও ফুরসত নেই।

বছর দু-তিন কাটার পর তরুণ বিজ্ঞানী হিসেবে তাদের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে দেশের নানা ইউনিভার্সিটি থেকে ডাক আসত। কনফারেন্সে পেপার পড়া, সেমিনারে অংশ নেওয়া ইত্যাদি। পরে আমন্ত্রণ আসতে লাগল দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আমেরিকা, ইউরোপ, কানাডা কি অস্ট্রেলিয়ার নানা ইউনিভার্সিটি থেকে। এইভাবে তাদের নিজস্ব একটা পৃথিবী তৈরি হয়ে গেল। তিথির কাছে গড়পার আরও সুদূর আরও ধূসর হয়ে যেতে লাগল। মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটা টিকে রইল শুধু দূরভাষের যন্ত্রটিতে। তুমুল ব্যস্ততার মধ্যে মাসে দু-একবার মাকে ফোন করে খবর নিত তিথি।

এদিকে একটা অপরাধবোধ বা মনস্তাপ অনেক দিন ধরেই দিবাকরকে কষ্ট দিচ্ছিল। তিনি দুঃসাহসী মিলিটারি অফিসার। লড়াই করেছেন কার্গিলে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। প্রবল শত্রুপক্ষকে প্রবল প্রতাপে ধ্বংস করেছেন। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে—ভারি কোমল, ভারি স্নিগ্ধ এক নারী—জয় করতে পারেননি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফৌজি রক্তের তেজ যখন কমে এসেছে, মনে হয়েছিল নিজের ইচ্ছাটাই জোর করে স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, ভালো লাগা মন্দ লাগাকে একেবারেই মর্যাদা দেননি। স্ত্রী রয়েছে, বাড়ি রয়েছে, কিন্তু মনোযোগ দিয়ে সংসারটা করা হয়ে ওঠেনি।

শেষ বয়সে, ফৌজি জীবনের মেয়াদ যখন ফুরিয়ে আসছে, রোজ দু'তিন বার করে সুজাতাকে ফোন করতেন দিবাকর। তিনি যে অনুতপ্ত, স্ত্রীর প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করা হয়নি—এই আক্ষেপটা বার বার জানিয়ে দিতেন। রিটায়ারমেন্টের পর জীবনের বাকি দিনগুলো সুজাতাকে সর্বক্ষণ সঙ্গ দেবেন। তাঁকে নিয়ে নানা জায়গায় বেড়াতে যাবেন। তাঁর যাবতীয় ক্ষোভ, অভিমান ঘুচিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন।

এতদিন নীরবে একা একা কাটিয়ে অনেকখানি নির্লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন সুজাতা। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করে কোনও দিন বলেননি—এই দেখ আমার এত কষ্ট, এই দেখ আমার এত দুঃখ। দুঃখকষ্টের বোধগুলি যৌবনকালে যতটা প্রবল থাকে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার ঝাঁঝ কমতে কমতে অসাড় হয়ে যায়। সুজাতা বলতেন, 'ভালোই তো। দেখা যাক—'

রিটায়ারমেন্টের পর কলকাতায় এসে সত্যি সত্যিই সারাক্ষণ স্ত্রীকে ঘিরে থাকতেন। খুশিতে আনন্দে তাঁকে মাতিয়ে রাখতে চাইতেন। এত বছরের ক্ষতিপূরণ এক লহমায় করার ইচ্ছা। সমস্ত আবেগ তখন শুকিয়ে এসেছিল সুজাতার। নানা রোগে শীর্ণ মানুষটির এমন তীব্র সঙ্গসুখ সহ্য করার শক্তি ছিল না। অবসরের পর দিবাকর তাঁকে মাত্র দু'মাসের জন্য পেয়েছিলেন। হঠাৎ দশদিনের ভাইরাস ফিভারে তাঁর মৃত্যু হল। দিবাকর কম চেষ্টা করেননি। কলকাতায় সেরা স্পেশালিস্ট ডাক্তারদের সবাইকে ডেকে একটা মেডিক্যাল বোর্ড বসিয়ে দিয়েছিলেন। ডাক্তার, চব্বিশ ঘণ্টার নার্স কোনও দিকেই ত্রুটি ঘটেনি। কিন্তু কিছুই করা গেল না। ঠাকুরদার তৈরি বিশাল সৌধে একেবারে একা হয়ে গেলেন দিবাকর। তাঁকে ঘিরে তখন অনন্ত শূন্যতা। কোনও কাজে চাড় নেই। কেমন যেমন ঝিমিয়ে পড়া, অবসাদগ্রস্ত, ম্রিয়মাণ। যে টগবগে ফৌজি অফিসার একদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করে বেড়াতেন সেই মানুষটা ঘরের কোণে নির্জীব হয়ে বসে বা শুয়ে থাকতেন।

সুজাতার মৃত্যুর মাস চারেক বাদে হঠাৎ একদিন পেটে অসহ্য একটা যন্ত্রণা হতে থাকে দিবাকরের। আগেও অল্প অল্প ব্যথা হত কিন্তু গ্রাহ্য করেননি। এবার ডাক্তার না ডেকে পারা যায়নি। নানারকম টেস্টের পর ধরা পড়ল স্টমাকে ক্যানসার। প্রথমে ওষুধ দিয়ে ইঞ্জেকশন দিয়ে সেটা নির্মূল

করার চেষ্টা করা হল। যন্ত্রণাটা কিছুদিনের জন্য কমল ঠিকই, কিন্তু মাস দুই-আড়াই পর ফের সেটা চাড়া দিয়ে উঠল। ডাক্তাররা জানালেন অপারেশন খুবই জরুরি। ডেটও ঠিক হয়ে গেল।

অপারেশনের আগে মেয়ে-জামাইকে খবর দিলেন দিবাকর। আগে তিনি তাদের কিছু জানাননি। তিথি আর সঞ্জয় পুনে থেকে যে ফ্লাইটটা প্রথম পাওয়া গেল সেটা ধরে উড়ে এল। এমন একটা সাংঘাতিক ব্যাপার কেন দিবাকর চেপে রেখেছিলেন, সেজন্য ক্ষোভে-দুঃখে কেঁদে ফেলল তিথি। সঞ্জয় কথা কম বলে। তার আবেগ বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না। বিষণ্ণ মুখে সে চুপচাপ বসে থেকেছে।

মেয়েকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করেছেন দিবাকর। 'তোদের কত কাজ। তাই আর টেনশনে ফেলতে চাইনি।' ভারী গলায় তিথি বলেছে, 'তাই বলে এমন সিরিয়াস ঘটনাটা জানাবে না?' তার চোখেমুখে ছিল অনন্ত অভিমান।

'এই তো জানিয়েছি।'—তিথির একটা হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে দিবাকর বলেছেন, 'অপারেশন তো আছেই। তাছাড়া অন্য একটা বিষয়ে তোদের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'কী বিষয়ে?'

দিবাকর জানিয়েছেন, অপারেশন হলেও তাঁর ধারণা, বেশিদিন বাঁচবেন না। কেননা ক্যানসার এমন এক রোগ যা মৃত্যুর পরওয়ানা নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। যে কোনও মুহূর্তে আয়ু শেষ। তাই মৃত্যুর আগে সমস্ত বিষয় আশয় তিথিকে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে চান। উত্তরাধিকারী হিসেবে আদিনাথ লাহিড়ি এবং সত্যদেব লাহিড়ি অর্থাৎ ঠাকুরদা আর বাবার লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি পেয়েছেন। সেসব সুদসমেত ব্যাঙ্কে অবিরল বেড়েই চলেছে। তা ছাড়া রিটায়ারমেন্টের পর দিবাকর নিজেও কম অর্থ পাননি। তাও ব্যাঙ্কে লং টার্মে ফিক্সড ডিপোজিট করা আছে। তার সঙ্গে রয়েছে গড়পারের বিশাল বাড়ি। তিনি স্থির করেছেন, তিথিরা যখন তাঁর অপারেশনের খবর পেয়ে কলকাতায় এসেই পড়েছে, একটা নাম-করা সলিসিটর ফার্মকে দিয়ে সব কিছু তিথিকে উইল করে দেবেন।

তিথি এবং সঞ্জয় উইলের ব্যাপারে রাজি হয়নি। তাদের যুক্তি : পুনে আর মুম্বাইতে সঞ্জয়দের প্রচুর প্রপার্টি রয়েছে। আছে ফার্ম হাউস এবং অজস্র পারিবারিক অর্থ। তা ছাড়া তারা দু'জনে ভালো রোজগার করে। তাদের আর কিছু দরকার নেই।

দিবাকর অনেক বুঝিয়েছেন কিন্তু তিথিদের টলানো যায়নি। শেষ পর্যন্তে হতাশভাবে জিগ্যেস করেছেন, 'এত টাকা পয়সা, প্রপার্টি আমার মৃত্যুর পর এসবের কি গতি হবে?'

তিথি বলেছে, 'বাবা, অল থ্রু ইওর লাইফ তুমি একজন ফাইটার। মৃত্যু নিয়ে এত চিন্তা করছ কেন? ক্যানসার হলেই কি সবাই সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়? রোগটা ধরা পড়ার পর ভালো ট্রিটমেন্টে অনেকে পনেরো কুড়ি বছরও বেঁচে থাকে। আমার বিশ্বাস, তুমি এখনও অনেকদিন বাঁচবে। অপারেশনটা হোক। তারপর ভেবে চিন্তে এই সব প্রপার্টি যাকে দিলে ভালো লাগবে তাকে দিও। তাড়াহুড়োর দরকার নেই।'

সেই যে তিথি অনেকদিন বেঁচে থাকার কথা বলছিল সেটা হয়তো বিশ্বাস থেকে বলেছে, নইলে নেহাতই সান্ত্বনা। দিবাকরের মৃত্যুচিন্তা বা মৃত্যুভয় তাতে বিলীন হয়ে যায়নি। তবে মেয়েকে এ নিয়ে আর কিছু বলেননি তিনি।

অপারেশন হয়ে গেল। দিন কুড়ি হাসপাতালে কাটিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন দিবাকর।

সঞ্জয় অপারেশনের পর পরই পুনে চলে গিয়েছিল কিন্তু তিথি কলকাতায় থেকে গেছে। ডাক্তাররা যা যা নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন সকালে এই ক্যাপসুল খেতে হবে, দুপুরে এই ট্যাবলেট, রাতে এই ওষুধ, তেল মশলাওলা খাবার পুরোপুরি বাদ, ঘড়ি ধরে খাওয়া, সঠিক সময়ে ঘুমনো, হালকা পায়ে ঘরে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি—দিবাকর হাসপাতাল থেকে ফেরার পর আরও একটা মাস কলকাতায় থেকে এসবের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল তিথি। এজন্য একজন ট্রেনড নার্সও রাখা হয়েছিল। ডাক্তাররা আরও একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন। মনকে দুশ্চিন্তামুক্ত রাখতে হবে। টিভি দেখা, গান শোনা, মজাদার গল্প টল্প পড়া—এসবের মধ্যেই সারাক্ষণ আনন্দে থাকতে হবে। কোনও রকম মানসিক চাপ নেওয়া চলবে না।

কিন্তু মৃত্যুর চিন্তা দিবাকরের পিছু ছাড়ছিল না। তিথি পুনেতে ফিরে গেল। নার্সটি সকালে এসে তাঁকে রাতের খাবার খাইয়ে চলে যায়। এই শ্যামবর্ণা সুশ্রী সেবিকাটি তাঁর একমাত্র সঙ্গী। অবশ্য কাজের লোকেরা সবাই তখনও রয়েছে। মাত্র একটি মানুষের জন্য দেড় গণ্ডা চাকর বাকর। কারওকেই তিনি ছাড়াননি। কতকাল ধরে গড়পারের বাড়ির সঙ্গে তারা জড়িয়ে আছে। হুট করে চলে যেতে বললে এই মানুষগুলো কোথায় যাবে? কী খাবে? দিবাকর ঠিকই করে ফেলেছিলেন, যত দিন তিনি আছেন, ওরাও থাকবে।

নার্সটির নাম জয়ন্তী। বয়স সাতাশ আটাশ। গোলগাল, আদুরে ধরনের চেহারা। দারুণ হাসিখুশি। চুলবুলে পাখির মতো সারাক্ষণ মজার মজার কথা বলে দিবাকরকে আনন্দে ভরিয়ে রাখতে চাইত। জয়ন্তীর সঙ্গ খুবই ভালো লাগত তাঁর। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বার বার আনমনা হয়ে যেতেন। পেছনে সেই মৃত্যুর ছায়া। জয়ন্তী যতক্ষণ থাকত, তবু একরকম কেটে যেত। কিন্তু রাত্তিরে সে তাঁকে বিছানায় তুলে দিয়ে পরিপাটি করে মশারি গুঁজে দিয়ে চলে যাবার পর অন্তহীন নৈঃশব্দ্য নেমে আসত গড়পারের বাড়িটা ঘিরে। বিজন নিশীথে সেই ছায়াটা গাঢ়তর হয়ে চারিদিক থেকে ঠেসে ধরত। ভাবতেন কাকে এই বিপুল সম্পত্তি দিয়ে যাবেন? ভেসে উঠত নানাজনের মুখ, নানা সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের নাম। কিন্তু কিছুই ঠিক করে উঠতে পারতেন না।

ক'মাস বেশ সুস্থ রইলেন দিবাকর। ক্বচিৎ কখনও মানুষের জীবনে অলৌকিক কিছু ঘটেও যায়। মনে হল, তাঁর বেলাতেও তেমনটাই ঘটেছে। সমস্ত রকম চাপমুক্ত, ভারমুক্ত হয়ে সামরিক অফিসারটি নিঃসঙ্গতার মধ্যেও ফের পুরনো মেজাজে ফিরে এলেন। তাই বলে লেশমাত্র বাড়াবাড়ি করলেন না। ডাক্তাররা যেসব নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে তা মেনে চলতে লাগলেন। যে দৈনন্দিন রুটিন তাঁরা ঠিক করে দিয়েছিলেন তার বাইরে একটা পাও ফেললেন না।

কিন্তু এই ফুরফুরে সুখের সময়টা খুবই স্বল্পায়ু। কিছুদিন বাদে ফের পেটে যন্ত্রণা শুরু হল। সারাক্ষণ কষ্ট। মাঝে মাঝে মনে হতো, পেটে কেউ ছুরি চালিয়ে দিচ্ছে।

জয়ন্তীকে ছাড়িয়ে দেননি দিবাকর। সে-ই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। যে ডাক্তাররা তাঁর অপারেশন করেছিলেন, নানারকম টেস্ট করে তঁদের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তাঁরাই তাঁকে দেশের সেরা ক্যানসার হাসপাতাল 'লাইফলাইন ক্যানসার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার'-এ ভর্তি হওয়ার সুপারিশে করলেন।

সংকেতটা ধরতে পেরেছিলেন দিবাকর। তিনি আর দেরি করেননি। তিথিদের সঙ্গে উইল নিয়ে কথা বলার পর ভেবে ভেবে ক'টা সোশাল ওয়েলফেয়ার মিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ঠিক করে ফেলেছিলেন। বাড়ি এবং টাকাপয়সা ভাগ করে এদের দেওয়া হবে। তা ছাড়া কাজের লোকদেরও প্রত্যেককে বেশ কিছু করে টাকা দেবেন। জয়ন্তী তাঁর যথেষ্ট সেবা করেছে। সে-ও ভালোই পাবে। তবে তাঁর মৃত্যুর আগে নয়।

তিথিদের সমস্ত জানিয়ে একটা নাম-করা সলিসিটর্স ফার্মকে দিয়ে উইল করেছেন। তারপর বাড়ির দেখাশোনার দায়িত্ব কাজের লোকেদের হাতে দিয়ে তিনি ক্রিশ্চান মিশনারিদের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

এখানকার ডাক্তাররা মেডিক্যাল তাঁর সার্জারির খুঁটিনাটি এবং কী কী ওষুধ তাঁকে খাওয়ানো হয়েছে, সমস্ত খুঁটিয়ে দেখে নতুন করে দিবাকরকে পরীক্ষা করলেন।

বোর্ডের যিনি প্রধান, অর্থাৎ ডাক্তার অ্যান্টনি কেরালার নিষ্ঠাবান ক্রিশ্চান। ষাটের ওপর বয়স। খুবই সৌম্য চেহারা। দেখলে মনে সম্ভ্রম জাগে। কালো রং কিন্তু চুল ধবধবে সাদা, সবসময় সেগুলো অগোছালো, হাওয়ায় উড়ছে, চিরুনি চালাতে তাঁর খেয়াল থাকে না। পুরু লেন্সের চশমার ভেতর তাঁর চোখ দু'টোয় অপার স্নিগ্ধতা। সারাক্ষণ মুখে হাসি। ধীরে ধীরে, গলার স্বর উঁচুতে না তুলে কথা বলেন। তবে অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। রোগীদের ধন্দে রাখেন না, মিথ্যে স্তোক দেন না, যা সত্যি তা জানিয়ে দেন। মানুষটি চিরকুমার। ক্যানসারের গবেষণা, পেশেন্ট, তাদের চিকিৎসা—এসবের মধ্যেই মগ্ন হয়ে আছেন। পার্থিব অন্য কোনও দিকে তাঁর লক্ষ্য নেই।

পরীক্ষা-টরীক্ষা হবার পর একদিন ডাক্তার অ্যান্টনি দিবাকরকে তাঁর চেম্বারে নিয়ে সামনাসামনি বসেছিলেন। 'কর্নেল লাহিড়ি, আপনাকে অন্ধকারে রাখতে চাই না।'

উৎসুক দৃষ্টিতে বয়স্ক, শ্রদ্ধেয় ধন্বন্তরির দিকে তাকিয়েছেন দিবাকর। কোনও প্রশ্ন করেন নি।

ডাক্তার অ্যান্টনি বলে যাচ্ছিলেন, আপনি দু' দু'টো যুদ্ধ করেছেন। এখনও একটা মারণ-ব্যাধির সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছেন। শেষের এই লড়াইটায় আমরা আপনার কো-ফাইটার।' একটু চুপ করে থেকে ফের শুরু করেছেন, 'আপনি একজন ভ্যালিয়ান্ট সামরিক অফিসার। আপনাকে পরীক্ষা করে যা যা বুঝতে পেরেছি, এবার বলব। আশা করি ভয় পাবেন না। সবাই জানে মানুষ ইমমর্টাল নয়। কেউ আগে চলে যায়, কেউ পরে। কেউ পৃথিবীর চিরস্থায়ী বাসিন্দা নয়। করুণাময় ঈশ্বরের এই বিধানকে না মেনে উপায় নেই।'

দিবাকরের বেশ মজাই লাগছিল। অভিজ্ঞ চিকিৎসা বিজ্ঞানীর ভেতর থেকে একজন ধর্মযাজক বা দার্শনিক যেন বেরিয়ে আসছিল। স্পষ্টভাষী হিসেবে যাঁর সুনাম, আসল কথাটা তিনি কিছুতেই যেন বলে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর কাজটা সহজ করে দিয়েছিলেন দিবাকর। হেসে হেসে বলেছেন, 'ডক্টর স্যার, যা আপনাদের মনে হয়েছে বলে ফেলুন। আমি সমস্ত কিছুর জন্যে প্রস্তুত।'

নতমুখে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকেছেন ডাক্তার অ্যান্টনি। একসময় মুখ তুলে বলেছেন, 'আপনার অসুখটা অনেকখানি ছড়িয়ে গেছে। আরেকটা সার্জারির রিস্ক আমরা নেব না। এখন কিছুদিন মেডিসিন চলুক। যতটা সম্ভব রিলিফ দেওয়া যায়। তারপর কেমোথেরাপি শুরু করতে হবে। আমি শুনেছি, আপনার একটি মাত্র মেয়ে আছেন—পুনেতে অধ্যাপনা করেন। তাঁকে খবরটা দেওয়া দরকার।'

কেমোথেরাপির কথা শুনে বুকটা ধক করে উঠেছিল। লহমায় সামলে নিয়ে খুব সহজ গলায় দিবাকর বলেছেন, 'নিশ্চয়ই দেব।'

'তা ছাড়া—'

'কী?'

'আপনার প্রপার্টি, অর্থ—এগুলোর বন্দোবস্তও করা প্রয়োজন। আমাদের হসপিটালের লিগাল সাইডটা দেখেন একজন নাম-করা ল'ইয়ার। তাঁদের ফার্ম আছে। ওঁদের বললে সব ব্যবস্থা করে দেবেন।'

দিবাকর হেসেছেন।—'আপনি আমার সম্বন্ধে এত ভেবেছেন, সেজন্যে অজস্র ধন্যবাদ। তবে এই হসপিটালে ভর্তি হবার আগেই উইল টুইল করে রেখেছি। আমার সাকসেসরদের কোনও অসুবিধে হবে না।'

ডাক্তার অ্যান্টনি বলেছেন, 'ঠিক কাজ করেছেন।'

ক্ষণিক নীরবতা।

চোখ আধবোজা করে কিছু ভেবে দিবাকর জিগ্যেস করেছেন, 'আমার একটা কৌতূহল মেটাবেন ডক্তার স্যার?'

'কী কৌতূহল?'

লঘু সুরে দিবাকর বলেছেন, 'আমি আর কতদিন বাঁচব?'

চমক লেগেছিল ডাক্তার এন্টনির। খেলাচ্ছলে কোনও পেশেন্টকে এমন প্রশ্ন করতে কোনও দিন শোনেননি ডাক্তার অ্যান্টনি। তাঁর মুখে মলিন একটি হাসি ফুটেছে। ধীরে ধীরে উত্তর দিয়েছেন, 'প্রভু যিশুর যতদিন ইচ্ছে।'

'এটা তো একজন নিষ্ঠাবান, ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্তের কথা। আমি মেডিক্যাল সায়েন্টিস্ট ডক্টর অ্যান্টনির কী ধারণা, সেটাই জানতে চাইছি।'

কয়েক লহমা চুপ করে থাকেন ডাক্তার অ্যান্টনি। তার পর দ্বিধা কাটিয়ে বলেছেন, 'চারমাস থেকে ছ'মাস। তবে আমরা চেষ্টা করে যাব।'

সেই যে দু'জনের কথা হয়েছিল তারপরও কয়েক সপ্তাহ নানা ধরনের ট্যাবলেট, ক্যাপসুল আর ইঞ্জেকশন দিয়ে রোগটাকে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন ডাক্তাররা। কিন্তু শেষ অব্দি সেটাকে রোখা যায়নি; ডালপালা মেলে আরও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। অগত্যা কেমোথেরাপি ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায়নি।

প্রথম কেমোটা হয়ে গেছে দিবাকরের।

মণিময় সরকারের কথা

ভবানীপুরের এক বনেদি বংশে মণিময়ের জন্ম হয়েছিল। বাবা, মা, জেঠামশায়, জেঠিমা এবং তিন জেঠতুতো দাদাকে নিয়ে তাঁদের জমজমাট পরিবার। সচ্ছল, একান্নবর্তী এবং অত্যন্ত সুশৃঙ্খল।

সংসারের বল্গাটি শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছিলেন জেঠামশায় অবনীনাথ

সরকার। আজীবন গান্ধিবাদী, মাঝারি হাইটের এই মানুষটির ছিল আকাশছোঁয়া ব্যক্তিত্ব। বাড়ির সমস্ত ব্যাপারে তাঁর কথাই শেষ কথা, তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর কারও টুঁ শব্দটি করার উপায় ছিল না। কোনও রকম অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, হই-হুল্লোড় পছন্দ করতেন না। নানা কোড অফ কন্ডাক্ট তৈরি করে দিয়েছিলেন। সবাইকে অক্ষরে অক্ষরে তা মেনে চলতে হতো।

অবনীনাথ ছিলেন একটা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। মণিময় শুনেছেন, কম বয়সে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন জেঠামশায়। জেলও খেটেছেন। কিন্তু ওসব তাঁর জন্মেরও আগের ঘটনা।

বাইরে থেকে দেখলে অবনীনাথকে একজন গ্রেট ডিক্টেটর মনে হয়। কিন্তু মণিময় জানেন বাইরের শক্ত খোলার ভেতরে ছিল এক আশ্চর্য স্নেহশীল, মায়াময় মানুষ।

মণিময়ের অল্প বয়সে তাঁর মা-বাবার মৃত্যু হয়। তাঁর যখন ছয়, মা মারা যান, দশ বছর বয়সে বাবাকে হারান। তারপর অপার মমতায় দু'হাতে ভাইপোকে আগলে আগলে রাখেন অবনীনাথ। একটা আঁচড়ও তাঁর গায়ে লাগতে দেননি।

মণিময় ছিলেন শান্ত, বিনয়ী, ছাত্র হিসেবে খুবই মেধাবী। কম বয়সে অবনীনাথই তাঁর রোল মডেল। তিনি যেভাবে বলতেন হুবহু সেইভাবেই চলতেন মণিময়, তার বাইরে একটা পাও ফেলতেন না।

প্রি-ইউনিভার্সিটিতে (এখনকার হায়ার সেকেন্ডারি) চোখধাঁধানো রেজাল্ট করার পর অবনীনাথ মণিময়কে সঙ্গে নিয়ে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দেন। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে থেকে ক্লাস করতে হতো। বছরে দু'বার, এক্স-মাসে আর পুজোয়, ভবানীপুরের বাড়িতে আসতেন।

জেঠতুতো দাদারা খুবই মাঝারি ধরনের ছাত্র। তাদের মধ্যে যে সবার বড়, এম.এ'তে কোনওরকমে একটা সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টে চাকরি পায়—আপার ডিভিসন ক্লার্ক! ঘষে ঘষে একদিন হয়তো সেকশন-ইন-চার্জ হবে। মেজদা একটা বছর নষ্ট করে তখন বি.কম ফাইনাল দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। ছোটদা বি.এসসি পাস কোর্সে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে।

মণিময় জানতেন, দাদারা তাঁকে খুব একটা পছন্দ করে না। তিনি ভালো ছাত্র, অবনীনাথ তাঁকে অনেক বেশি স্নেহ করেন, বাড়িতে এলে গলে যান। তাঁকে নিয়ে কী করবেন, কী খাওয়াবেন, ভেবে পেতেন না। কাজের লোকেদের সারাক্ষণ হুকুম, মণির ঘর ফিটফাট করে রাখ, ওর ময়লা জামাকাপড় লন্ড্রিতে দিয়ে আয়, ওর জন্যে তালশাঁস সন্দেশ আর ভালো চকোলেট কেক কিনে আন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দাদারা হিংসেয় ভেতরে ভেতরে যে পুড়ে যাচ্ছে তাদের মুখ দেখে তা স্পষ্ট টের পাওয়া যেত। রাগে, অসন্তোষে তারা গনগন করত। কিন্তু জেঠামশাইয়ের মুখের ওপর টুঁ শব্দটি করার সাহস বা বুকের পাটা তাদের কারও ছিল না। অবনীনাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন, মুখ বুজে ওরা তা হজম করে যেত।

মণিময়ের মনে আছে, একবার ছুটিতে বেনারস থেকে কলকাতায় আসার পর একদিন অবনীনাথ তাঁকে ওঁর বেডরুমে ডেকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কাছে বসিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি এখন সাবালক হয়েছ। তোমাকে সব জানানো প্রয়োজন।'

অবনীনাথ কী জানাতে চাইছেন, বুঝতে না পেরে একটু অবাক হয়েই তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন মণিময়। তবে কোনও প্রশ্ন করেননি।

অবনীনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলেছেন, 'আমাদের পারিবারিক যে বিষয় সম্পত্তি আর টাকাপয়সা আছে তার অর্ধেকটা তোমার বাবার, বাকি অর্ধেকটা আমার। আইনত, ন্যায়ত তোমার অংশ তোমাকে বুঝিয়ে দিতে আমি বাধ্য।'

বিষয় আশায় নিয়ে আগে কখনও কিছু ভাবেননি মণিময়। এসব চিন্তা কোনও দিন তাঁর মাথায় আসেনি। ভালো রেজাল্ট করতে হবে, এটাই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান, একমাত্র লক্ষ্য। স্নান খাওয়া ঘুম আর ইউনিভার্সিটির ক্লাস ছাড়া বাকি সময়টা ছাড়া হয় লাইব্রেরিতে ছুটতেন, নইলে হস্টেলে বইয়ের ভেতর ডুবে থাকতেন। বাড়িতে এলে একগাদা বই সঙ্গে নিয়ে আসতেন। সারাক্ষণ বই আর বই। অবনীনাথ সম্পত্তি টম্পত্তির কথা তোলায় কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন।

জেঠামশায় ফের বলেছেন, 'আমার ছেলেদের মতিগতি ভালো নয়। হিংসুটে, স্বার্থপর। তোমাকে ওরা সহ্য করতে পারে না। নেহাত আমি আছি তাই মুখ বুজে আছে। হঠাৎ আমার কিছু হয়ে গেলে এ বাড়ির ত্রিসীমায় ওরা তোমাকে ঘেঁষতে দেবে না। তোমার প্রাপ্য একটা পয়সাও পাবে বলে মনে হয় না।'

এবারও কোনও উত্তর দেননি মণিময়। বিমূঢ়ের মতো শুধু তাকিয়ে থেকেছেন।

অবনীনাথ থামেননি, 'ন্যায্য পাওনা থেকে তুমি বঞ্চিত হও, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। আমার স্বাস্থ্য এখনও যথেষ্ট ভালো। সামান্য জ্বরজারি সর্দিকাশি ছাড়া কঠিন অসুখ কখনও হয় না। আমার ধারণা মোটামুটি সুস্থ শরীরে আরও সাত আট বছর বেঁচে থাকব। তার মধ্যে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরিয়ে আসবে, ভালো চাকরিও পেয়ে যাবে। তখন তোমাকে সমস্ত বুঝিয়ে দেব। একটা সলিসিটর্স ফার্মের সঙ্গে মোটামুটি কথাও বলে রেখেছি। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ঠিক সময়ে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' একটু থেমে ফের বলছেন, 'এই যে তুমি পড়াশোনা করছ, তোমার জন্যে খরচ হচ্ছে, এটা কারও দয়ায় নয়। তোমার বাবার টাকায় এসব চলছে।'

বিপুল ব্যক্তিত্বের অধিকারী অবনীনাথ এমনিতে ছিলেন সরল, সাদাসিধে। কথায় বার্তায় আচরণে লেশমাত্র দম্ভ ছিল না। কিন্তু একটা ব্যাপারে ছিল প্রবল অহমিকা। সেটা তাঁর স্বাস্থ্য, তাঁর আয়ু। অবনীনাথের ধারণা ছিল তাঁর স্বাস্থ্য অটুট, কম করে পঁচাশি-ছিয়াশি বছর বাঁচবেন। কিন্তু বয়স যে চোরাবানের মতো ভেতরে ভেতরে ক্ষয় ধরিয়ে দিয়েছে প্রথম দিকে টের পাননি।

যে বছর মণিময় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরুলেন সেবারই মাত্র কয়েকদিনের জ্বরে আচমকা মারা গেলেন অবনীনাথ। শ্রাদ্ধ ট্রাদ্ধ চুকে যাবার কিছুদিন বাদে জানা গেল, পারিবারিক বিষয় সম্পত্তির একটি কানাকড়িও তিনি পাবেন না। আকস্মিক মৃত্যুর জন্য অবনীনাথ তৈরি ছিলেন না। তাই ভাইপোর নামে তিনি কোনও পাকা ব্যবস্থাই করে যেতে পারেননি। জেঠতুতো ভাইরা কারচুপি করে ধুরন্ধর উকিলের সাহায্য নিয়ে পারিবারিক বিষয় আশয়ের সবটাই নিজেদের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল।

তখন মণিময়ের বয়স মাত্র চব্বিশ। মা-বাবার মৃত্যুর পর জেঠামশায় তাঁকে দুই ডানা মেলে আগলে রেখেছিলেন। জীবন ছিল মসৃণ, বিঘ্নহীন, নিরাপদ। অবনীনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যেন খান খান হয়ে গেল। পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ পাবেন না। না আছে আশ্রয়, না আছে টাকাপয়সা। প্রথমটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন মণিময়। মনে হয়েছে কেউ যেন হাত-পা বেঁধে মহাসমুদ্রের মাঝখানে তাঁকে ছুড়ে দিয়েছে।

কলকাতার মতো বিশাল মেট্রোপলিসে কত যে ল'ইয়ার তার লেখাজোখা নেই। তাদের কারওকে দিয়ে কেস করলে কোনও একদিন হয়তো নিজের ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করা যেত। কিন্তু সেজন্য বছরের পর বছর লেগে যায়। মামলার খরচ চালাতে দরকার অজস্র টাকা। তত ধৈর্য, তত সময় আর তত অর্থ তখন কোথায় মণিময়ের? আইন আদালতের কথা তাঁর মাথাতেই আসেনি। সেই মুহূর্তে যেটা তাঁর কাছে সব চেয়ে জরুরি তা হল মাথা গোঁজার মতো একটা ডেরা, তারপর অবশ্যই একটা চাকরি। তিনি মনস্থির করে ফেলেছিলেন ভবানীপুরের বাড়িতে জীবনে আর কখনও আসবেন না। বিষাক্ত, নোংরা সরীসৃপের মতো তিন জেঠতুতো ভাইয়ের কাছ থেকে লক্ষ যোজন তফাতে চলে যাবেন।

কলকাতায় জন্ম হলেও এই শহরকে সেভাবে চিনতেন না মণিময়। উত্তরে চৌরঙ্গি, দক্ষিণে কুদঘাট, পুবে বালিগঞ্জ এবং পশ্চিমে চেতলা, এই ছিল তাঁর চেনাজানার চৌহদ্দি। আঠারো বছর বয়সে প্রি-ইউনিভার্সিটি পাস করেই তো তিনি বেনারস চলে গেলেন। এই মহানগরকে আঁতিপাঁতি করে দেখার সুযোগ পেলেন কোথায়?

সেদিন সর্বস্ব খোয়াবার পরে একটা সুটকেসে ক'টা জামাপ্যান্ট, শেভিং বক্স, টুথব্রাশ, টুথ পেস্ট এমনি টুকিটাকি কিছু জিনিস ভরে বেরিয়ে পড়েছিলেন মণিময়। ভরসা বলতে পকেটে ছিল সাতশো একুশ টাকা এবং কিছু খুচরো। সেই আমলে ওই টাকাটা মোটেই হেলাফেলা করার মতো নয়। অন্তত দেড় দু' মাস দম ফেলার সময় পাওয়া যাবে। তার ভেতর কিছু কি আর জুটবে না? বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া মণিময়ের আত্মবিশ্বাস ছিল প্রবল। তাঁর ধারণা আপাতত যা মিলবে তা হয়তো মনের মতো হবে না, তবে পা রাখার মতো একটা ধাপ

নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তারপর দেখেশুনে বড় কোনও কোম্পানিতে চলে যাবার হাজারটা সুযোগ নিশ্চয়ই এসে যাবে।

মণিময় কার কাছে যেন শুনেছিলেন, নাকি বাংলা গল্পের বইতে পড়েছিলেন, মির্জাপুর স্ট্রিট আর হ্যারিসন রোডে লাইন দিয়ে সব মেস-বাড়ি রয়েছে। সেখানে সস্তায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। দু'টো বাস বদলে, কন্ডাক্টর এবং রাস্তার লোকজনকে জিগ্যেস করে এই এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিলেন মণিময়। দু-তিনটে মেস ঘোরার পর একটা মোটামুটি পছন্দ হল। যিনি ভবানীপুরের মস্ত ইমারতে আর বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির সুবিশাল ক্যাম্পাসে জন্মের পর থেকে কাটিয়ে এসেছেন, হ্যারিসন রোডের মেস তাঁর কতটা আর ভালো লাগতে পারে। আদ্যিকালের ছিরিছাঁদহীন সেকেলে তিনতলা বাড়িটায় আলো-হাওয়া ঢোকে না। বেজায় স্যাঁতসেঁতে। বারোয়ারি কলতলায় শ্যাওলার পুরু স্তর, এঁটো বাসনের ডাঁই। এক-একটা ঘরে দু-তিনজন করে বোর্ডার। তাদের বেশির ভাগই মার্চেন্ট কি সরকারি অফিসের কেরানি। কেউ কেউ ইন্সিওরেন্সের দালাল। তা ছাড়া স্কুল মাস্টার, ছোটখাটো কোম্পানির সেলসম্যানও রয়েছে অনেক। সকালে সন্ধেয় যখন রান্নাঘরে কয়লার উনুন ধরানো হয়, মেস-বাড়িটা পুরোপুরি গ্যাস-চেম্বার হয়ে ওঠে। যাঁর পকেটে মাত্র সাতশো একুশটি টাকা রয়েছে তাঁর পক্ষে এখানে না উঠে উপায়ই বা কী?

এই মেসে এক-একটা ঘরে তিনজন চারজন করে বোর্ডার। ভিড়ের ভেতর থাকার অভ্যাস কোনও কালেই নেই মণিময়ের। একটু বেশি ভাড়া দিয়ে চিলেকোঠার একখানা ছোট্ট কামরা তিনি পেয়ে গেলেন। সেটা তাঁর একান্ত নিজস্ব।

মেসের বোর্ডাররা মানুষ খারাপ না। কারও নাক-গলানো স্বভাব নেই। যে যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

চিলেকোঠায় নিজের ঘরে নানা খবরের কাগজ ঘেঁটে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত লিখে কাছের পোস্ট অফিসে গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে আসেন মণিময়। সকালের দিকটা এভাবেই কেটে যায়। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ডালহৌসিতে চলে যান। অফিসে অফিসে হানা দিয়ে খোঁজ নেন কোনও ভ্যাকান্সি আছে কি না।

আশ্চর্য, কাগজ দেখে যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো ছেড়ে ছিলেন, তার ফল প্রায় হাতে হাতেই পাওয়া গেল। দিন পনেরোর ভেতর চারটে কোম্পনি থেকে ইন্টারভিউ'র জন্য ডাক এল। চার কোম্পানিই মণিময়কে পেতে ভীষণ আগ্রহী। এদের ভেতর সবচেয়ে যেটা নাম-করা, সেখানেই জয়েন করবেন ঠিক করলেন। ডেপুটি ওয়ার্কস ম্যানেজারের পোস্ট।

নৈহাটির কাছে গঙ্গার ধার ঘেঁষে 'গ্রাহাম অ্যান্ড স্মিথ'-এর বিশাল ফ্যাক্টরি। তা ছাড়া বম্বে, দিল্লি এবং মাদ্রাজেও এদের কারখানা রয়েছে।

মেসের পাওনা মিটিয়ে একমাসের ভেতর নৈহাটিতে চলে গেলেন মণিময়। জীবনের প্রথম চাকরি, প্রথম কর্মস্থল। সমস্ত কিছু স্বপ্ন মনে হচ্ছিল।

গঙ্গার ধারে অন্য সব বড় অফিসারদের বাংলোর পাশে তাঁকেও একটা বাংলো দেওয়া হল। চারটে বড় বড় শোবার ঘর, মস্ত ডাইনিং-কাম-ড্রইং রুম। কিচেন। কাজের লোকেদের জন্য আলাদা থাকার বন্দোবস্ত। বাংলোর সামনে বিশাল 'লন'।

একটি মাঝবয়সী রাঁধুনি, অন্য কাজের জন্য আরও দু'জন, সবসুদ্ধ তিনটে লোক নিয়ে দিন চমৎকার কেটে যাচ্ছিল। মণিময় খুব একটা মিশুক ধরনের নন, কিছুটা অন্তর্মুখী। হইচই, পার্টি—এসব পছন্দ করেন না। নানা বিষয়ে পড়াশোনার ভীষণ ঝোঁক। ডিউটি আওয়ার্সের পর বাংলোয় ফিরে বইয়ের ভেতর ডুবে যেতেন।

'গ্রাহাম অ্যান্ড স্মিথ'-এর অন্য অফিসাররা মণিময়কে টেনে-হেঁচড়ে অফিস ক্লাব, পার্টি, ককটেল ইত্যাদি নানা হুল্লোড়বাজিতে নিয়ে যেতে চাইতেন কিন্তু তিনি একের পর এক অছিলা খাড়া করে খুবই বিনীতভাবে এড়িয়ে যেতেন। অফিসাররা ক্রমশ টের পাচ্ছিলেন, যুবক ইঞ্জিনিয়ারটি পুরোপুরি অন্য ধাতের। তাঁদের সঙ্গে আদৌ খাপ খাবে না। মণিময় সম্পর্কে ওঁরা দ্রুত উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন। কাছাকাছি থাকলে বা পাশাপাশি একই অফিসে কাজ করলে যতটুকু ভদ্রতা বজায় রাখতে হয়, সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। 'কেমন আছেন?' 'ভালো আছি'—ইত্যাদি।

জীবনটা মোটামুটি নিজের মতো করে গুছিয়ে এনেছিলেন মণিময়। কিন্তু ফের তা তছনছ হয়ে গেল।

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফার্স্ট ক্লাস, সুপুরুষ, তার ওপর বড় চাকরি, প্রচুর টাকা মাইনে, কোম্পানির দেওয়া মস্ত বাংলো, সব মিলিয়ে এমন সৎপাত্র লাখে একটা মেলে না। পাকা আম-কাঁঠালের গন্ধে যেমনটা হয়, মাছির ঝাঁকের তো শিক্ষিত সুন্দরী তরুণীদের বাবা কাকা আত্মীয়স্বজনেরা মণিময়কে ছেঁকে ধরতে লাগল। 'গ্রাহাম অ্যান্ড স্মিথ' কোম্পানির যে অফিসাররা তাঁকে টানাটানি করে ক্লাব কি পার্টিতে নিয়ে যেতে না পেরে দূরে সরে গিয়েছিল, আচমকা তাদের যেন টনক নড়ে ওঠে। এমন একটা ছেলেকে তো হাতছাড়া করা যায় না। আলাদা আলাদা করে লুকিয়ে চুরিয়ে তাঁর বাংলোয় ওরা হানা দিতে লাগল। ঘন হয়ে বসে পরম শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো তাদের কেউ বলে, 'ইউথ হচ্ছে লাইফের সবচেয়ে বেস্ট টাইম। একা একা থেকে এই সময়টা নষ্ট করে দিচ্ছ! এর কোনও মানে হয়?'

নিঃস্বার্থ পরামর্শ দানের জন্য এরা যে আসেনি, সেটা আঁচ কন্বা যেত। এদের কোনও একটা গভীর উদ্দেশ্য যে রয়েছে তাও বুঝতে পারতেন মণিময় কিন্তু সেটা যে কী, গোড়ার দিকে ধরতে পারতেন না। বেশ অবাক হয়েই বলতেন, 'নষ্ট করছি মানে?'

'নষ্ট নয়? এই বয়সে ইউ নিড আ সুইট কম্পেনিয়ন। যদি বল আমার শালীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। শি ইজ এক্সকুইজিটলি বিউটিফুল। ইউ উইল লাইক হার। নেক্সট সানডে'তে বিশাখাকে আসতে বলি?'

কেউ তার ভাইঝি, কেউ ভাগনি, কেউ পিসতুতো বোনকে গছাবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। দাঁতে দাঁত চাপা এক প্রতিযোগিতা।

শুধু মণিময়ের সহকর্মীরাই নন, তিনি যে একজন লোভনীয় 'স্যুটেবল বয়' সেই খবরটা 'গ্রাহাম অ্যান্ড স্মিথ' কোম্পানির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে অনেকদূর অব্দি ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্যামনগর, ইছাপুর, নৈহাটি, হালিশহর, গঙ্গার ওপারের চুঁচুড়া, এমনকি কলকাতা থেকেও মেয়েদের বাবা-কাকা-মেসোরা আসতে লাগল। তবে সবচেয়ে বেশি আসতেন চন্দ্রনাথবাবু—চন্দ্রনাথ কর। তাঁর বাড়ি দমদমে। প্রথম দিকে একদিন পর পর সন্ধের মুখে অফিস থেকে ফিরে মণিময় দেখতেন ড্রইং রুমে গুটিসুটি মেরে বসে আছেন চন্দ্রনাথ। আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ, ভালোমানুষ ধরনের চেহারা। চোখে গোলাকার বাইফোকাল চশমা। পরনে ধুতির ওপর লম্বা ঝুলের

ফুলশার্ট। পায়ে চটি, হাতে ফেবর লিউবা কোম্পানির সেকেলে ঘড়ি। চোখে মুখে কেমন যেন জড়সড়, কুণ্ঠিত ভাব।

আগে একদিন বাদ দিয়ে আসতেন। পরে রোজ আসতে লাগলেন। মণিময়কে দেখামাত্র উঠে দাঁড়াতেন চন্দ্রনাথ। করুণ সুরে প্রতিদিন একই আর্জি তাঁর। রিটায়ার করেছেন। ক'দিনই বা আর বাঁচবেন। একটি মাত্র মেয়ে। অত্যন্ত মেধাবী। ফিজিক্স অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস। এম. এসসি দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় আরও ভাল রেজাল্ট করবে বলেই চন্দ্রনাথের ধারণা। বাপ হয়ে তো মেয়ের রূপের কীর্তন গাওয়া যায় না। তবে কাবেরী অর্থাৎ তাঁর মেয়ে এক কথায় খুবই সুন্দর। পাত্রী হিসেবে মণিময়ের পুরোপুরি যোগ্য।

চন্দ্রনাথ রিটায়ার্ড মানুষ। পেনসনটুকু বাদ দিলে টাকাপয়সা বিশেষ কিছুই নেই। মণিময় যদি করুণা করে কন্যাদায় থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন, চিরঋণী হয়ে থাকবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মণিময় যতই না না করেন, যতই জানান আপাতত বিয়ে করার তাঁর লেশমাত্র ইচ্ছা নেই কিন্তু কে কার কথা শোনে! হাতজোড় করে অবিরল তিনি একঘেয়ে ঘ্যানঘেনে সুরে বলে যান, 'দয়া করুন, দয়া করুন—'

যখন দেখা গেল মণিময় ঘাড় বাঁকিয়েই রয়েছেন তখন অন্য রাস্তা দরলেন চন্দ্রনাথ, 'ঠিক আছে, বিয়ের কথা পরে হবে। আপনি শুধু কষ্ট করে একবার আমার মেয়েটাকে দেখে আসুন।' তাঁর বলার ভঙ্গিতে এমন একটা বিশ্বাস ছিল যে দেখামাত্র পছন্দ হয়ে যাবে মণিময়ের।

জোঁকের মতো অনবরত পেছনে লেগে থাকাটা ব্যর্থ হয়নি। অধ্যবসায়ের ফল পাওয়া গিয়েছিল। শেষ অব্দি চন্দ্রনাথ করের মেয়েকে দেখতে রাজি হয়েছেন মণিময়।

রবিবারের এক বিকেলে চন্দ্রনাথ এসে তাঁকে ওঁদের দমদমের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। খুব সাদামাঠা দোতলা বাড়ি। মধ্যবিত্ত সংসারের ছাপ সর্বত্র। তবু তারই মধ্যে বাইরের ঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে ফিটফাট করে রাখা হয়েছিল। হাজার হোক, ছেলে পাত্রী দেখতে আসছে। নোংরা ময়লা অগোছালো ঘরে তো তাকে বসানো যায় না।

মেয়েকে নিয়ে আসার আগে বাইরের ঘরে বেশ কয়েকজন এসে হাজির। দু-একজন ছাড়া বাকি সবাই রীতিমতো লম্বাচওড়া। জামাকাপড়ের আবরণ ভেদ করে তাদের বলিষ্ঠ শরীরের আভাস ফুটে বেরুচ্ছিল। চন্দ্রনাথ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ওদের কেউ মেয়ের কাকা, অন্যরা জেঠতুতো পিসতুতো বা মামাতো ভাই।

একসময়ে কাবেরীকে আনা হল। গুণবতী রূপবতী মেয়ের যা বর্ণনা চন্দ্রনাথের মুখে আগে শুনেছেন, কাবেরী তার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর।

সেন্টার টেবলের অন্য দিকে নীরবে, মুখ নামিয়ে বসে ছিল কাবেরী। মণিময় যা জিগ্যেস করছিলেন তার জবাব অবশ্য দিল। কিন্তু খুবই সংক্ষেপে, নীরস গলায়। ক্বচিৎ কখনও মুখ তুলে তাকাচ্ছিল। কিন্তু কেমন যেন নিস্পৃহ। মণিময় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। একটু খুঁটিয়ে লক্ষ করতে মনে হয়েছে, তার মধ্যে শক্ত, কঠোর একটা ভাব রয়েছে।

কাবেরীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ মণিময়ের নজর পড়েছিল তার কাকা এবং দাদাদের দিকে। তারা একদৃষ্টে তাকিয়েছিল কাবেরীর দিকে। তাদের চোখেমুখে অদ্ভুত এক রূঢ়তা। কারণটা কী, বুঝতে পারেননি মণিময়। সেই মুহূর্তে অন্য কিছু ভাবতেও চাননি তিনি। কাবেরীর আচরণ তাঁর কাছে বিসদৃশ না হলেও অদ্ভুত ঠেকেছিল।

মেয়ে দেখার পর ফিরে যেতে যেতে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন মণিময়। তিনি নাম-করা ফার্মের বড় অফিসার, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফার্স্ট ক্লাস, বিরাট অঙ্কের স্যালারি তাঁর, মস্ত বাংলো, সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, পায়ের সামনে সিঁড়ি সাজানোই আছে, প্রোমোশন পেতে পেতে একদিন হয়তো আকাশ ছুঁয়ে ফেলবেন। আর তাঁর সম্বন্ধেই একটি সামান্য মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির মেয়ে কিনা এতটা নিরাসক্ত, এতটা উদাসীন! নিজের সম্পর্কে কী ভাবে মেয়েটা! আজকাল রাজপুত্রেরা আর নেই, তবে কোটিপতিরা রয়েছে। তাকে পাওয়ার জন্য এদের বাড়ির ছেলেরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাকি? কাবেরীর আচরণ পীড়া দিচ্ছিল মণিময়কে। ধারালো কাঁটার মতো তাঁর অহংবোধ অবিরল খোঁচা দিয়ে যাচ্ছিল।

কোয়ার্টারে ফিরে এসেছিলেন রাশীকৃত অস্বস্তি নিয়ে। সেটার মাত্রা ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। রাত্তিরে ভাল করে খেতে বা ঘুমোতে পারেননি। আহত অহমিকা তাঁকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। দিন দুই পর তিনি সিদ্ধান্ত

নিয়েছিলেন কাবেরীকেই বিয়ে করবেন। মেয়েটার দন্ত খান খান করে না দেওয়া অব্দি কোনও কাজেই মন বসাতে পারছিলেন না। চন্দ্রনাথকে খবর দিয়ে এনে সে কথা জানাতে লোকটা যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেয়ে গিয়েছিল।

বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল নির্বিঘ্নেই। তবে বিয়ে বাড়ির হইচই এবং ভিড়ের মধ্যে একটা ব্যাপার মণিময়ের নজরে পড়েছিল, কাবেরীর ষণ্ডামার্কা সেই মাসতুতো পিসতুতো ভাই আর তাদের দলবল সারাক্ষণ বিয়ের মণ্ডপ ঘিরে কাবেরীকে পাহারা দিয়েছে।

বিয়ে চুকে গেলে কাবেরীকে তাঁর বাংলোয় নিয়ে এসেছিলেন মণিময়। তাঁর সহকর্মী যে অফিসারেরা তাদের বোন, শালী কি ভাইঝি টাইঝিদের তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছে সেজন্য তারা কিন্তু কোনও রকম বিদ্বেষ পুষে রাখেনি। সবাই হই হই করে বরযাত্রী হিসেবে মণিময়ের সঙ্গে দমদমে তো গিয়েছিলই, বেশ জমকালো বউভাতেরও আয়োজন করেছিল। তাদের স্ত্রীরা এবং অফিসার্স কলোনির অন্য মেয়েরাও ফুলশয্যার সব দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। মণিময় তাঁর জেঠতুতো ভাই বা অন্য আত্মীয় পরিজন কারওকেই বিয়েতে ডাকেননি। জেঠামশায়ের মৃত্যুর পর উইল জাল করে জেঠতুতো দাদারা যখন সমস্ত পারিবারিক বিষয় সম্পত্তি ছিনিয়ে নিল তখন থেকেই জীবনের যে পর্বটা ভবানীপুরের বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেটা পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছেন মণিময়।

বউভাতের রাতে খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ হলে অফিসার্স কলোনির মেয়ে-বউরা মণিময় এবং কাবেরীকে বাংলোর একটা বিশাল ঘরে পৌঁছে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

ঘরের মাঝখানে নতুন খাট অজস্র জুঁই, রজনীগন্ধা এবং গোলাপ দিয়ে সাজানো। নতুন বিছানায় ঢেলে দেওয়া হয়েছে আতর। ঘরের বাতাস ম ম করছিল। অফিসার্স কলোনির মেয়ে এবং বউরা কাবেরীকেও ফুলের সাজে সাজিয়ে দিয়েছিল। সে. পরেছিল লাল বেনারসি। সিঁথিতে লম্বা করে সিঁদুরের টান, কপালে সিঁদুরের টিপ।

একধারে ধূপদানি থেকে সুগন্ধি ধূপের গন্ধ উঠে আসছিল। হালকা নীলাভ আলো জ্বলছিল ঘরে। ধূপের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, আতরের গন্ধ,

বাইরে রেকর্ডে সানাই বাজছে—এসবের মাঝখানে মায়াকাননের কোনও পরীর মতো মনে হচ্ছিল কাবেরীকে।

খাটের একটা বাজু ধরে দাঁড়িয়ে ছিল কাবেরী। এই মেয়েটির অহঙ্কার ধুলোয় মিশিয়ে দেবার জন্য যে তাকে বিয়ে করেছেন সেটা আর মনে রইল না মণিময়ের। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি স্ত্রীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। একেবারে পলকহীন। গভীর এক আবেগে ভরে যাচ্ছিল মন। বুকের ভেতর অবিরল শিহরন অনুভব করছিলেন তিনি।

একসময় অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে স্ত্রীর কাছাকাছি চলে এসেছিলেন মণিময়। তার কাঁধে আলতো করে একটা হাত রেখে বলেছিলেন, 'এসো—'

কাবেরী বুঝতে পেরেছে, মণিময় তাকে খাটে উঠতে বলছেন। সে কিন্তু শক্ত করে খাটের বাজুটা ধরে রেখেছিল। সোজাসুজি মণিময়ের চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল, 'আমি বেশি পাওয়ারের লাইটটা জ্বালছি।'

বেশ অবাক হয়েছিলেন মণিময়। তারপর গাঢ় গলায় বলেছেন, 'আজকের রাতের পক্ষে এই হালকা নীল আলোটাই তো সবচেয়ে স্যুটেবল। মনে হচ্ছে, একটা সুইট ড্রিম।'

স্বপ্নের ধার দিয়েও যায়নি কাবেরী। বলেছে, 'এই লাইট আলোয় চোখমুখ ভাল দেখা যায় না। আপনার সঙ্গে আমার কিছু ইমপর্টান্ট কথা আছে। সেজন্যে ব্রাইট আলো দরকার।' বলেই নিজেই দেওয়াল হাতড়ে সুইচ খুঁজে বার করে জোরালো টিউব লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

মণিময় হতচকিত। বিমূঢ়ের মতো তিনি কাবেরীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

কাবেরী বলেছে, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না। আপনি খাটে বসুন, আমি ওই চেয়ারটায় বসছি।'

নিজের অজান্তেই খাটের এককোণে বসে পড়েছিলেন মণিময়। আর দেওয়ালের ধার থেকে একটা গদিমোড়া চেয়ার টেনে এনে কাছাকাছি বসেছিল কাবেরী। যত শিক্ষিত বা সপ্রতিভই হোক না, ফুলশয্যার রাতে সব মেয়েই লজ্জায় খানিকটা হলেও জড়সড় হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে শিরায় শিরায় অবশ্য বইতে থাকে সফেন সুখের স্রোত। কিন্তু কাবেরীর মধ্যে লেশমাত্র জড়তা ছিল না। তার বসার টান টান ভঙ্গিতে, চোখের স্থির

চাহনিতে ছিল অদ্ভুত ধরনের ঋজুতা। সে বলেছিল, 'আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'কী অনুরোধ?'

'দয়া করে আমাকে মুক্তি দিন।'

ফুলশয্যার রাতে যখন অপার্থিব কোনও স্বপ্নের অন্দর মহলে পা রাখতে চলেছেন, নিবিড় করে পেতে চলেছেন পরীর মতো এক রমণীকে সেই সময় কাবেরীর এমন আচরণ মণিময়কে দিশেহারা করে ফেলে। অনেকক্ষণ হতবাক তাকিয়ে থাকেন তিনি। তারপর জিগ্যেস করেছেন, 'মুক্তি?'

'হ্যাঁ। আমি একজনকে ভালবাসি।'

আচমকা সারা শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো কিছু খেলে যায় মণিময়ের। মনে হয়েছিল, তাঁর শিরা স্নায়ু ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণের বিহ্বলতা লহমায় কাটিয়ে উঠে চাপা গলায় চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'যাকে ভালবাস তাকেই তো বিয়ে করলে পারতে। আমার ক্ষতিটা করলে কেন?'

কাবেরী জানিয়েছিল, তার কোনও উপায় ছিল না। এম.এসসি'র রেজাল্ট বেরুবার পর সে ঠিক করেছিল, তার প্রেমিককে নিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে চলে যাবে কিন্তু তার আগেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। শুরু হয় চব্বিশ ঘণ্টার নজরদারি। তার জেঠতুতো মাসতুতো ভাইয়েরা মার্কামারা মাস্তান। কাবেরী বেশি জোরাজুরি করলে তার প্রেমিকটিকে শেষ করে ফেলত।

চকিতে কাবেরীর বাবা চন্দ্রনাথের নিরীহ, বিপন্ন চেহারাটা মণিময়ের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। বিয়ের আগে যখনই তাঁর কোয়ার্টারে আসতেন, হাতজোড় করে থাকতেন। মুখটা সারাক্ষণ করুণ। কন্যাদায়গ্রস্ত লোকটার দিকে তাকিয়ে সহানুভূতিই বোধ করতেন মণিময়। কিন্তু তার পেটের ভেতর এত যে জিলিপির প্যাঁচ, মেয়েকে গছাবার জন্য এটা যে অতি ধূর্ত এক কৌশল তখন তা টের পাওয়া যায়নি। মেয়ে দেখার দিন কাবেরীর মাস্তান মাসতুতো পিসতুতো ভাইরা কেন যে তাকে ঘিরে বসে ছিল, তার কারণটাও এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মন তিক্ততায় ভরে গিয়েছিল মণিময়ের। জিগ্যেস করেছিলেন, 'আমাকে বিয়ে করতে যখন আপত্তিই ছিল, আগেই জানিয়ে দাওনি কেন?'

কাবেরী বলেছে, 'কী করে জানাব?'

'একটা চিঠি লিখলেও তো পারতে।'

'চিঠি একটা লিখতে পারতাম কিন্তু পাঠাব কী করে? আগেই বলেছি, সব সময় আমাকে পাহারা দিয়ে রাখা হত।'

মণিময় উত্তর দেননি।

কাবেরী এবার বলেছে, 'এ বিয়ে যে চাই না, আপনি যেদিন আমাকে দেখতে গিয়েছিলেন, হাবভাবে তা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। আপনি হয়তো বুঝতে পারেননি।'

মেয়ে দেখার দিন কাবেরীর সেই কঠোর, উদাসীন মুখটা নতুন করে মনে পড়ে গিয়েছিল মণিময়ের। তার ইঙ্গিতটা সেদিন সত্যিই বুঝতে পারেননি। মেয়েটা তাঁকে উপেক্ষা করছে, এই ধারণাটাই তাঁর মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর হঠাৎই মণিময়ের খেয়াল হয়েছিল যে প্রেমিকের জন্য কাবেরী তাঁর সঙ্গে বিয়েটা নাকচ করে দিতে চাইছে, সে কেমন? নিশ্চয়ই তাঁর চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত, অনেক প্রতিষ্ঠিত, তাঁর তুলনায় সামাজিক মর্যাদা অনেক, অনেক বেশি। কৌতূহল হচ্ছিল মণিময়ের, হয়তো সূক্ষ্ম একটু ঈর্ষাও।

মণিময় জিগ্যেস করেছিলেন, 'যে ছেলেটিকে ভালবাস সে কী করে?'

'তেমন কিছু নয়, বেলঘরিয়ায় তাদের ইলেক্ট্রিক্যাল গুডসের একটা দোকান আছে।'

কথায় কথায় আরও জানা গিয়েছিল। ছেলেটি অর্থাৎ বিজন কোনওরকমে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছে। রোগা, কালো। অসুখ বিসুখ লেগেই আছে। বিধবা মা আর একটা ছোট বোন নিয়ে তাদের ফ্যামিলি। বাবা ছিলেন নৈহাটির এক জুট মিলের লেজার কিপার। টাকাপয়সা কিছু রেখে যেতে পারেননি। থাকার মধ্যে আছে সেকেলে একতলা একখানা বাড়ি।

শুনতে শুনতে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন মণিময়।—'এই ছেলের জন্যেই আমার কাছে মুক্তি চাইছ?'

চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নেড়েছিল কাবেরী।

কটু গলায় মণিময় বলেছেন, 'প্রেমের বেশ তেজ আছে।'

জবাব দেয়নি কাবেরী।

তীব্র বিরাগ, ক্রোধ এবং উত্তেজনায় মাথার ভেতর রক্ত ফুটছিল। বলেছিলেন, 'তোমার মতো মেয়ের সঙ্গে জীবন কাটানো অসম্ভব। তুমি কোর্টে গিয়ে ডিভোর্স চাও। আমি তক্ষুনি লিখে দেব। কিন্তু—'

কাবেরী মুখ তুলেছিল। তার চোখে নীরব প্রশ্ন ফুটে উঠেছে। কিছুটা বা উৎকণ্ঠাও।

মণিময় বলেছেন, 'তুমি তো চলে যাবে। তারপর লোকে যে আমার গায়ে থুতু দেবে, তার কী হবে?'

আচমকা হুড়মুড় করে মণিময়ের পায়ের ওপর আছড়ে পড়েছিল কাবেরী। তাঁর দুই পা আঁকড়ে ধরে ব্যাকুলভাবে বলেছে, 'আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে ক্ষমা করুন—'

'নাটকের আর দরকার নেই। ক্ষমা বললেই সাত খুন মাপ হয়ে যায় না।' কাবেরীর কাঁধ ধরে ফের চেয়ারে বসিয়ে দিতে দিতে কঠোর গলায় মণিময় বলেছিলেন, 'আজ রাতটা তুমি এই ঘরে শুয়ে থাকো। আমি ড্রইং রুমে যাচ্ছি। কাল সকালেই তুমি চলে যাবে।'

বিব্রতভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে কাবেরী।— 'না না, আমিই বাইরের ঘরে যাচ্ছি।' ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রায় দৌড়েই সে ড্রইং রুমে চলে গিয়েছিল।

ফুলের গন্ধ, ধূপের গন্ধ, আতরের গন্ধ, বাইরে উতরোল সানাই—কোনও কিছুই অনুভূতিতে সাড়া তুলতে পারছিল না মণিময়ের। আকাশ থেকে পূর্ণিমার চাঁদ হাজারটা কলস উপুড় করে তরল রুপো ঢেলে দিচ্ছিল সমস্ত চরাচর জুড়ে। কিন্তু কোনও দিকেই লক্ষ্য ছিল না তাঁর। চোখের সামনে সমস্ত কিছুই শূন্য হয়ে গিয়েছিল। এমন ফুলশয্যা আর কোনও পুরুষের জীবনে হয়েছে কি না জানা নেই মণিময়ের।

পরদিন সকালে ড্রইং রুমে আসতেই চোখে পড়েছিল, ঘরটা ফাঁকা। খুব সম্ভব অন্ধকার থাকতে থাকতেই চলে গেছে কাবেরী।

বউ পালিয়েছে। এমন একটা গরম গরম মুখরোচক খবর কি আর চাপা থাকে? অফিসার্স কলোনির বাসিন্দারা কেউ মুখ বাঁকিয়ে, কেউ ঠোঁট টিপে

টিপে হাসত। সেই হাসিতে যা থাকত তা হল ধিক্কার, বিদ্রূপ। এমন একটা মশলাদার ঘটনা হাতে পেলে কে আর কাঁটা ফোটাতে ছাড়ে! ঠোঁটকাটা যারা, তাদের মুখে কিছুই আটকাত না। ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে বলত, 'এত বেছে বেছে একটা বউ জোগাড় করলে। তাকে ধরে রাখতে পারলে না হে। রাত পোহাতে না পোহাতে সে ভেগে পড়ল!'

অফিসার্স কলোনির আবহাওয়া ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছিল। তিনি ট্রান্সফার নিয়ে বম্বে প্ল্যান্টে চলে যান। একটা ব্যাপার স্পষ্ট মনে আছে মণিময়ের। কাবেরী যে পালিয়ে গেছে, সেই খবরটা তার বাপের বাড়িতে জানাবার প্রয়োজন বোধ করেননি তিনি। চন্দ্রনাথও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি।

জেঠতুতো দাদারা এবং কাবেরী তাঁর সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই দু'টো মারাত্মক ধাক্কা সারা জীবন আর সামলে উঠতে পারেননি মণিময়। একদা সরল, ভদ্র এই মানুষটির পৃথিবীর কারও প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না, কারওকে বিশ্বাস করতেন না। ভেতরে ভেতরে ভেঙেচুরে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বম্বেতে বেশ কিছু বেয়াড়া বন্ধুবান্ধব জুটেছিল। তারা মাতাল, লম্পট। হাত ধরে এরাই তাঁকে অধঃপতনের অন্ধকার সুড়ঙ্গে পৌঁছে দিয়েছিল। ফ্যাক্টরির ডিউটি আওয়ার্স ছাড়া বাকি সময়টা তিনি মদে চুর হয়ে থাকতেন। সেই সঙ্গে নিত্য নতুন মেয়েমানুষ। বাঙালি, ওড়িয়া, মারাঠি, সিন্ধি। হাতে অঢেল পয়সা থাকলে বম্বের মতো কসমোপলিটান শহরে সুন্দরী মেয়েরা মাছির ঝাঁকের মতো ছেঁকে ধরে।

বছরের পর বছর কেটে যায়। চুল পেকে পেকে মাথার আধাআধি যখন সাদা হয়ে গেছে, সেই সময় একদিন বুকে যন্ত্রণা শুরু হল। প্রথমটা গ্রাহ্য করেননি মণিময়। দু'চারটে পেইন-কিলার খেয়ে একটু কমল ঠিকই কিন্তু সেটা যে খুব সাময়িক আরাম সেটা বোঝা গেল সপ্তাহখানেক বাদেই। যন্ত্রণাটা বাড়তে বাড়তে দ্রুত মারাত্মক হয়ে উঠল। মনে হতে লাগল করাত দিয়ে ভেতরটা কেউ চিরে ফেড়ে ফেলছে। ব্যথা কমার ট্যাবলেট দিয়ে এই কষ্ট কিছুতেই রোখা যাবে না। অগত্যা কোম্পানির ডাক্তারকে ডাকতেই হল। তিনি ব্লাড, ইসিজি থেকে শুরু করে নানারকম টেস্ট করালেন। টেস্টের রিপোর্টগুলো দেখে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ডাক্তারের পরামর্শে

কোম্পানি মণিময়কে বম্বের এক নাম-করা ক্যানসার হাসপাতালে ভর্তি করল। চিকিৎসার যাবতীয় খরচ তারা দেবে।

ডাক্তার যা সন্দেহ করেছিলেন তা-ই। ক্যানসার হয়েছে মণিময়ের। লাং ক্যানসার। বম্বের হাসপাতালে কয়েক মাস কাটানোর পর তাঁকে পাঠানো হয়েছিল 'লাইফ লাইন ক্যানসার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার'-এ। তাঁর দু'টো কেমো হয়ে গেছে। এখানকার ডাক্তার অ্যান্টনির ধারণা, দিবাকর লাহিড়ির মতো তাঁর আয়ুও ফুরিয়ে এসেছে। বড় জোর পাঁচ কি ছ'মাস।

কোনও পিছুটান নেই মণিময়ের। 'লাইফ লাইন ক্যানসার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার'-এ আসার আগেই তিনি উইল করেছেন। কোম্পানি থেকে তাঁর যা পাওনা হবে—প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি ইত্যাদি,—সবই পাবে পুনের একটা অরফ্যানেজ। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পর।

শুভেন্দু বসুর কথা

দিবাকর লাহিড়ি বা মণিময় সরকারের মতো শুভেন্দুর জীবনে কোনও রকম জটিলতা নেই।

তাদের ছোট্ট সংসার। সে, তার দাদা দীপঙ্কর, বউদি মৃদুলা এবং মা প্রতিভা। বাবা হিরণ্ময় বসু বছর সাতেক আগে মারা গেছেন।

হিরণ্ময় ছিলেন একটা মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির টপ একজিকিউটিভ। দাদা একটা কলেজে ফিজিকসের প্রফেসর। বউদিও কলেজে পড়ায়, তার সাবজেক্ট ফিলোজফি। মা ছিলেন অ্যাডভোকেট। বাবার মৃত্যুর পর তিনি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন।

দক্ষিণ কলকাতায় লেকের কাছাকাছি শুভেন্দুদের ঝাঁ-চকচকে তেতলা বাড়ি। তিনটে গাড়ি। তিনটে ড্রাইভার। গণ্ডাখানেক কাজের লোক। যে পরিমাণ টাকা থাকলে দু'হাতে খরচ করে, মাসে দু'বার পার্টি দিয়ে, দেশ বিদেশ ঘুরে, অফুরান আনন্দে কাটিয়ে দেওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশিই আছে ওদের।

তেইশ বছর বয়সে চোখ-ধাঁধানো রেজাল্ট করে ইকনমিকসে এম.এ পাস করেছিল। তারপর কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে ব্যাঙ্কে অফিসার গ্রেডে চাকরি পায় সে। জীবনটা মসৃণ গতিতেই এগিয়ে যাবার কথা ছিল। মায়ের

বান্ধবীর মেয়ে শ্রীরাধাকে—যার ডাকনাম রুমি—ভালবাসত। রুমিও ছাত্রী হিসেবে দারুণ। শুভেন্দুর চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। সে যে বার এম.এ পাস করে, সেই বছর ইংরেজি অনার্সে পার্ট-টু দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে রুমি। ঠিক ছিল আরও দু'বছর বাদে ওর এম.এ পরীক্ষাটা হয়ে গেলে তাদের বিয়ে হবে। ওদের বাবা-মা'দেরও সেরকমই ইচ্ছা ছিল।

কিন্তু ভবিষ্যতের সমস্ত পরিকল্পনা লহমায় খান খান হয়ে গেল। সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার। গলার ডান পাশে প্রথমে সামান্য ব্যথা ব্যথা। গ্ল্যান্ড ফুলে উঠেছিল শুভেন্দুর। দাদা বউদি এবং মা'র ধারণা, ঠাণ্ডা লেগে এমনটা হয়েছে। গরম সেঁক টেক নিলে ঠিক হয়ে যাবে।

সেঁকে কাজ হল না। অগত্যা ডাক্তার ডাকতে হল। কিছুদিন চলল ট্যাবলেট, ক্যাপসুল। কিন্তু গ্ল্যান্ডের ব্যথা আর কমে না। শেষ পর্যন্ত স্পেশালিস্ট ডাকতে হল। নানারকম টেস্টের পর মারাত্মক সত্যটা জানা গেল—ক্যানসার। রুমিদের এবং তাদের—দুই পরিবারে লহমায় গাঢ় বিষাদ নেমে আসে। রুমিকে সামলানো যাচ্ছিল না। কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে যাচ্ছিল সে। দু'চোখ থেকে জল ঝরে যাচ্ছিল অবিরল।

অন্তহীন উৎকণ্ঠার মধ্যেও ক্ষীণ একটু দুরাশা আঁকড়ে ধরেছিল দুই পরিবারের মানুষজন। ক্যানসার হলেই কেউ তক্ষুনি মরে যায় না। ঠিকমতো চিকিৎসা করলে পুরোপুরি সেরে ওঠাও সম্ভব। অন্তত একজন পেশেন্ট অনেকদিন অব্দি বেঁচে থাকতে পারে। শুভেন্দুর মা ছেলের জন্য কী না করেছেন? কলকাতায় তো বটেই তাকে নিয়ে ছুটেছেন মুম্বাই, চেন্নাইয়ের সেরা ক্যানসার স্পেশালিস্টদের কাছ। টাকা খরচ হয়েছে জলের মতো।

কিন্তু না, সেভাবে কেথাও ভরসা পাওয়া যায়নি।

শেষ অব্দি 'লাইফলাইন ক্যানসার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার'-এ শুভেন্দুকে ভর্তি করা হয়েছে। দু'টো অপারেশনও করা হয়ে গেছে। কেমোও শুরু হয়েছে। ডাক্তার অ্যান্টনির ধারণা এরও আয়ু খুব বেশি দিন নয়।

'লাইফলাইন'-এ ভর্তি হবার আগে রুমিকে চিঠি লিখে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিল শুভেন্দু। এই পৃথিবী থেকে আর মাত্র কয়েকটা সপ্তাহ কি কয়েকটা মাস পর যে চিরবিদায় নিয়ে চলে যাবে তার কথা ভেবে ভেবে

ব্যাকুল হবার কোনও মানে হয় না। রুমির সামনে অফুরান ভবিষ্যৎ। কেন সে শুভেন্দুর জন্য নিজেকে ক্ষয় করে করে শেষ করবে? নিজের জীবনকে ফের নতুন করে গড়ে তুলুক। রুমির জন্য অনন্ত শুভকামনা রইল তার।

* * *

দিবাকর লাহিড়ি, মণিময় সরকার আর শুভেন্দু বসু—তিন ক্যানসার পেশেন্ট ক'দিনই বা বাঁচবেন? হাসপাতালের চৌহদ্দির ভেতর প্রচণ্ড কড়াকড়ি এবং নজরদারির মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। জীবন সেখানে একঘেয়ে, ক্লান্তিকর, বিস্বাদ। প্রতিটি দিন একই করম একই ছাঁচে তৈরি। একই বৃত্তে পাক খাওয়া। যেন একটা অন্যটার ফোটোকপি। সকালে কিছুক্ষণ প্রাতর্ভ্রমণ, তারপর কটেজে ফিরে খানিক জিরিয়ে নিতে না-নিতেই ব্রেকফাস্ট এসে হাজির। সেই পর্ব শেষ হলেই নার্স এসে ট্যাবলেট খাইয়ে যায়। ট্যাবলেটের পর খবরের কাগজ পড়া, স্নান, দুপুরের খাওয়া সেরে ঘণ্টা দেড় দুই ঘুম। বিকেল হলেই ফের নার্স এসে ক্যাপসুল খাইয়ে যায়। এবেলা ওষুধ খাওয়ার পর আবার ঘণ্টাখানেক বেড়ানো। সন্ধেবেলা কটেজে ফিরে চা-বিস্কুট। সেটি সাঙ্গ হলে তৃতীয় বার নার্সের আবির্ভাব। এবার ইঞ্জেকশন। ইঞ্জেকশনটা ভীষণ তেজি। ওটা নেবার পর অনেকক্ষণ মাথা ঝিম ঝিম করে। তখন ইজিচেয়ারে কি বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকতে হয়। সাড়ে আটটায় ডিনার। ন'টা বাজলে শুয়ে পড়তেই হবে। দৈনন্দিন এই রুটিনের বাইরে একটা পাও বাড়ানোর উপায় নেই।

আজন্মের চেনা জগৎটাকে ছেড়ে যাওয়ার ঘোষণা যখন দিবারাত্র শোনা যাচ্ছে, এক-একটা দিন কাটছে আর আয়ু আরও একটু কমছে, সেই সময় দিবাকররা ঠিক করেছেন ক'টা দিন নিজেদের মতো করে কাটিয়ে দেবেন। ফুরফুরে মেজাজে। কোনও রকম নিয়ম-শৃঙ্খলার তোয়াক্কা না করে। ছিন্নবাধা, বেপরোয়া বালকের মতো। এই পৃথিবীকে শেষবারের মতো তাঁরা দেখতে চান।

তিন

যে পথটা পাহাড়টাকে পাকে পাকে জড়িয়ে রয়েছে সেটা ধরে একসময় নিচে নেমে এলেন দিবাকররা।

পাহাড়ের ঠিক তলাতেই শহর সোনাডিহি। ভারি ছিমছাম। রাস্তাগুলো পরিষ্কার, ঝকঝকে। কোথাও এতটুকু আবর্জনা জমে নেই। চারিদিকে বিস্তর দালান কোঠা। কিন্তু কোনও বাড়িই দোতলার বেশি উঁচু নয়। কাঠের বাড়িও রয়েছে অগুনতি।

সোনাডিহির মাঝখান দিয়ে শহরের সবচেয়ে জমকালো রাস্তাটা সোজা দূরের হাইওয়েতে গিয়ে পড়েছে। দিবাকরদের নীল অ্যামবাসাডর সেদিকেই চলেছে।

মিনেট পাঁচেকের মধ্যে শহরের ঘন জমজামাট এলাকা পেরিয়ে এলেন দিবাকররা। এখানে বাড়িটাড়ি কম। অল্প যে ক'টা আছে, গায়ে গায়ে লেগে নেই, বেশ দূরে দূরে। চারিদিকে প্রচুর ফাঁকা জায়গা, ঝোপঝাড়।

সূর্য এতক্ষণে দিগন্তের তলা থেকে পুরোপুরি উঠে এসেছে। কুয়াশার বেড়াজাল ছিঁড়েখুঁড়ে নেমেছে সোনালি রোদের ঢল।

হাইওয়েতে এসে পড়লেন দিবাকররা। চওড়া, মসৃণ, তেলতেলে পথটা বাঁ দিক থেকে এসে সোজা ডাইনে দৌড় লাগিয়েছে।

মণিময় জিগ্যেস করলেন, 'কোন দিকে যাবেন দিবাকরদা?'

দিবাকর বললেন, 'আমাদের সব দিকই সমান। চল, ডাইনে যাওয়া যাক।'

গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে চালাতে লাগলেন দিবাকর। এই সকালবেলাতেও হাইওয়েতে প্রচুর যানবাহন। জিপ, ভ্যান রিকশা, প্রাইভেট কার। তবে সব চাইতে বেশি করে যা চোখে পড়ে তা হল ভিন রাজ্যের ট্রাক। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান কি ইউ পি থেকে মালবোঝাই হয়ে সেগুলো আসছে। মসৃণ রাস্তা পেয়ে লাইন দিয়ে সাঁই সাঁই উড়ে চলেছে। দানবের মতো বিশাল আকারের গাড়িগুলোর কাঁধে কেউ যেন অদৃশ্য ডানা জুড়ে দিয়েছে।

দু'ধারে ধানের খেত। আকাশ যেখানে পিঠ ঝুঁকিয়ে দিগন্তে নেমে গেছে ততদূর শুধুই ফসলের মাঠ। মাঝে মাঝে পেন্সিলের আঁচড়ের মতো আবছা আবছা দু'চারটে চাষীদের গাঁ।

হেমন্তের গোড়া থেকেই ধান কাটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বেশির ভাগ মাঠই এখন ফাঁকা। বাকিগুলো সোনালি ফসলের লাবণ্যে ভরে আছে। কিন্তু ক'দিন আর? বড় জোর দু-এক সপ্তাহ। তার মধ্যেই সেই ধানও জমির মালিকদের ঘরে উঠে যাবে।

যেসব জমিতে এখনও ফসল রয়েছে, ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো টিয়া তার ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ধারাল ঠোঁটে ঠুকরে ঠুকরে প্রাণভরে খেয়ে যাচ্ছে পাকা ধান।

হাইওয়ের বাঁ ধার দিয়ে একটা লম্বা খাল একটানা পাশাপাশি চলেছে তো চলেছেই। খালটা মনে হয় খুব গভীর। এই হেমন্তে স্রোত নেই। টলটলে স্বচ্ছ জল স্থির হয়ে আছে। খানিকটা পর পর পারাপারের জন্য বাঁশের সাঁকো।

হেমন্তের এই সকালে ক্রমশ তপ্ত হয়ে ওঠা রোদ, অবারিত শস্যক্ষেত্র, অফুরান আকাশ, বুনো টিয়ার ঝাঁক—সব কিছুই খুব ভাল লাগছিল দিবাকরদের।

হঠাৎ শুভেন্দু ওধারের জানালার পাশ থেকে উঁচু গলায় জিগ্যেস করে, 'ওগুলো কী পাখি?' বলে খালের ওপর একটা সাঁকো দেখিয়ে দেয়। সাঁকোটার অনেকগুলো বাঁশের খুঁটি। সেগুলোর মাথায় পাঁচ ছ'টা পাখি ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে। তাদের চোখ খালের জলের দিকে।

পাখিগুলোর পালকে মাথায় গলায় নানা রঙের বাহার। শুভেন্দু বলল, 'এমন পাখি আগে কখনও দেখিনি। কলকাতায় চড়াই আর কাক ছাড়া তো কিছুই চোখে পড়ে না।'

দিবাকর গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিলেন।—'কলকাতায় যা পলিউশন, আর ক'বছরের মধ্যে কাক আর চড়াইও নির্বংশ হয়ে যাবে।' কথা বলছিলেন ঠিকই, তাঁর চোখ তিন্তু উইন্ডস্ক্রিনের কাচ ভেদ করে সাঁকোটার দিকে চলে গিয়েছিল। মুগ্ধ হয়ে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বললেন, 'গ্র্যান্ড—' তারপর মণিময়কে জিগ্যেস করলেন, 'শুভেন্দু তো চেনে না। তুমি চিনতে পারছ?'

মণিময় সামান্য অপ্রস্তুত। ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'গাছপালা, পশুপাখি—মানে নেচার টেচার নিয়ে কখনও কিছু ভাবিনি। হয়তো এই ধরনের পাখি কখনও দেখেছিলাম। ঠিক মনে করতে পারছি না।'

দিবাকর বললেন, 'এগুলো হল কিং ফিশার—মাছরাঙা। পঞ্চাশ বাহান্ন বছর আগে আমাদের ফ্যামিলি ডায়মন্ডহারবারে বেড়াতে গিয়েছিল। তখন দেখেছিলাম। এতকাল বাদে আবার দেখতে পেলাম।'

'আপনার স্মৃতিশক্তি তো দারুণ। সেই ছেলেবেলায় দেখা পাখির নাম, চেহারা মনে করে রেখেছেন!'

দিবাকর উত্তর দিলেন না। একটু হেসে শুভেন্দুকে বললেন, 'তোমার ক্যামেরাটা বার করে পাখিগুলোর ছবি তুলে রাখো। যেভাবে বৃক্ষনিধন, খালবিল বুজিয়ে নগরায়ণ চলছে, এই পাখিও আর থাকবে না। একটা স্মৃতি অন্তত ধরে রাখা যাক।' এই স্মৃতি কার জন্য? তাঁর খেয়াল রইল না, ডাক্তার অ্যান্টনির ধারণা তাঁদের আয়ু বড় জোর আর ছ'টা মাস।

শুভেন্দু তার ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বার করল। দিবাকর বলল, 'কোনও রকম আওয়াজ না করে নামতে হবে। শব্দ কানে গেলে তক্ষুনি উড়ে যাবে।'

পা টিপে টিপে, চুপিসারে তিনজন নেমে পড়লেন। মাছরাঙারা যে সারাক্ষণ মৌনীবাবাদের মতো জগৎ সংসার সম্পর্কে নিরাসক্ত হয়ে বসে আছে তা কিন্তু নয়। জলের তলায় মাছেদের নড়াচড়া টের পেলেই পাকা ডাইভাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠোঁটে ট্যাংরা, পুঁটি, ল্যাটা কি খলসে গেঁথে তুলে এনে খেয়েই ফের ধ্যানে বসে যাচ্ছে।

পাখিগুলোর নানা কায়দার মাছ ধরা এবং চুপচাপ বসে থাকার সাত-আটটা ছবি তোলা হলে দিবাকররা গাড়িতে ফিরে এলেন। আবার নীল অ্যামবাসাডর দৌড় শুরু করে।

স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে দিবাকর কিছু ভাবছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'এই যে আমরা পাঁচদিনের সফরে বেরিয়েছি, যখন যা ফোটো তোলা হবে সেগুলো দিয়ে একটা অ্যালবাম করলে কেমন হয়?'

মণিময় এবং শুভেন্দু তক্ষুনি সায় দিল।—'ফার্স্ট ক্লাস।'

এর মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে কত ধরনের পাখি যে বেরিয়ে পড়েছে! হেমন্তের আকাশকে রঙের ছটায় ভরিয়ে দিয়ে তারা উড়ে যাচ্ছে পুব থেকে পশ্চিমে,

উত্তর থেকে দক্ষিণে। একমাত্র সারি বাঁধা ধবধবে বক ছাড়া অন্য পাখিদের চিনতে পারলেন না দিবাকররা।

শুভেন্দু আপসোসের সুরে বলল, 'পাখিগুলো এত উঁচু দিয়ে যাচ্ছে যে ক্যামেরায় ধরা গেল না। ধরতে পারলে আমাদের অ্যালবাম খুব কালারফুল হতো।'

হাইওয়ের ধারে লাইন দিয়ে অজস্র ঝাড়ালো গাছ। বেশির ভাগেরই ডালপালা পাতাই সার। মাঝে মাঝে দু-চারটে গাছ লাল নীল হলুদ ফুলে ছেয়ে আছে। আকাশের পাখিদের ছবি তোলা যায়নি। তবে গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে ফুলের ফোটো তোলা হল।

আরও অনেকটা যাবার পর দেখা গেল, সূর্য আকাশের ঢালু গা বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে। রাস্তায় গাড়ি টাড়ি অনেক বেড়ে গেছে। মানুষজনও। এতক্ষণ হাইওয়ের চারিদিক থেকে যে পাঁচমেশালি আওয়াজ উঠে আসছিল, এখন তা একশো গুণ জোরালো হয়ে উঠেছে।

শুভেন্দু বলল, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে। এবার ব্রেকফাস্টটা করে নিলে হয় না?'

হাসপাতাল থেকে কোনও রকমে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিন জন। এখন অব্দি এক ফোঁটা চা-ও পেটে পড়েনি। দিবাকর এবং মণিময়ের খুব খিদে পেয়েছিল। চলার ঝোঁকে ছিলেন বলে খেয়াল হয়নি। শুভেন্দুর কথায় হঠাৎ সেটা টের পেলেন। পেটের ভেতরটা চুঁই চুঁই করছে। দু'জনে একসঙ্গে বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—'

এক জায়গায় হাইওয়ের গা ঘেঁষে খালের কিনারে খানিকটা ঘাসের জমি। দিবাকর গাড়িটা সেখানে এনে থামালেন। ব্যাগ থেকে পাউরুটি, মাখন আর জ্যামের কৌটো বার করে খাওয়া শুরু করলেন। সেই সঙ্গে লঘু চালে এলোমোলো, টুকরো টাকরা কথাও চলছে।

মণিময় বললেন, 'আমাদের না পেয়ে এতক্ষণে হাসপাতালে নিশ্চয়ই হুলস্থূল বেধে গেছে।'

শুভেন্দু বলল, 'কোয়াইট পসিবল। সুপার ডাক্তার স্মিথ আমাদের খুঁজে বার করার জন্যে খুব সম্ভব গোয়েন্দা বাহিনী লাগাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন।'

একটু ভেবে মণিময় বললেন, 'মোবাইল ফোনে বরং জানিয়ে দেওয়া হোক, আমাদের জন্যে যেন চিন্তা না করেন। পাঁচদিন পর আমরা ঠিক ফিরে যাব।'

জ্যাম মাখানো রুটি আয়েশ করে চিবুতে চিবুতে আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন দিবাকর।—'নো, নো। ফোন করার দরকার নেই। করলে ডাক্তার স্মিথ সহজে ছাড়বেন? কেন হাসপাতাল থেকে পালালাম, কোথায় আছি, কোথায় যাব—এমনি হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে। ওঁর মতো রেসপেক্টেবল মানুষকে তো আর মিথ্যে বলা যাবে না। তার চেয়ে চুপচাপ থাকা ভালো। যখন ফিরব তখন হয়তো কোর্ট মার্শালের সামনে দাঁড়াতে হবে। তখনকার কথা তখন। আপাতত হাসপাতালটা মাথা থেকে বার করে দাও—'

ব্রেকফাস্ট শেষ হলে আরও কিছুক্ষণ পর ফের গাড়িতে উঠলেন তিনজন। সকাল থেকে একনাগাড়ে ড্রাইভ করেছেন দিবাকর। ক্লান্তি বোধ করছিলেন। তাই এবার স্টিয়ারিং ধরে বসেছেন মণিময়।

গাড়ি হাইওয়ে ধরে আবার চলেছে। খুব জোরে নয়, মাঝামাঝি স্পিডে। মিনিট দশেক পর একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ে। অগুনতি ভ্যান রিকশা আর তিন চাকাওলা ছোট ছোট ভ্যান কাতার দিয়ে রাস্তার বাঁ পাশ ঘেঁষে চলেছে। ভ্যানগুলো মালপত্রে ঠাসা আর প্রতিটি ভ্যান রিকশায় গাদাগাদি করে বসে আছে নানা বয়সের মানুষজন—বুড়োবুড়ি, যুবক যুবতী, মাঝবয়সী থেকে কিশোর কিশোরী, বাচ্চা কাচ্চা।

কোথায় চলেছে এত লোকজন? রীতিমতো কৌতূহল হচ্ছিল দিবাকরদের।

দিবাকর মণিময়কে বললেন, 'স্পিড কমিয়ে ওদের পাশ দিয়ে দিয়ে চল তো—' বলে ভ্যান ট্যানগুলো দেখিয়ে দিলেন।

একটা ভ্যান রিকশার পাটাতনে বসে আছে আধ-বুড়ো একটি লোক, বয়স্কা একটি সধবা মেয়েমানুষ, একজন বছর চল্লিশের না-যুবক না-প্রৌঢ় এবং তিরিশ বত্রিশ বছরের ঘোমটা-টানা একটি লাজুক বউ। তা ছাড়া বছর নয় দশের একটি বালিকা এবং এগারো বারো বছরের একটি কিশোর।

ছোট মেয়েটির সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুরের টান, কপালে সিঁদুরের মস্ত

ফোঁটা, হাতে শাঁখা পলা এবং রুপোর চুড়ি। পরনে লালপাড় নতুন শাড়ি, সেটার জমিতে নানারকম নকশা। গলায় রুপোর গোট হার, কানে মাকড়ি, নাকে নাকফুল। কালো কষ্টিপাথর কুঁদে কুঁদে যেন তাকে গড়া হয়েছে, প্রতিমার মতো বড় বড় টানা চোখ। কিশোরটির গোলগাল ভালমানুষ মার্কা চেহারা। তার পরনে নতুন ধুতি আর কালো ডোরা-কাটা লাল জামা। সকলের পোশাকে আশাকে, চোখে মুখে গেঁয়ো ছাপ।

ভ্যান রিকশাটার পাশে আসতেই দিবাকর আধ-বুড়ো লোকটাকে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার নাম কী কর্তা?'

পাক্কা সাহেবসুবো ধরনের একজন দামি মোটর গাড়ির আরোহী তাকে ডেকে কথা বলছেন, লোকটা হকচকিয়ে যায়। জড়সড় ভঙ্গিতে বলে, 'বেচারাম মণ্ডল।'

ভ্যান রিকশার অন্য যারা বসে আছে তাদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিবাকর বলেন, 'এরা?'

বেচারাম জানায় তার সঙ্গীরা তারই পরিবারের লোকজন।

'তোমরা সব চলেছ কোথায়?'

'ঠাকুরবাবার মেলায়।'

অন্য ভ্যান রিকশা এবং তিন চাকাওলা ভ্যানগুলো দেখিয়ে দিবাকর বলেন, 'এরাও মেলায় যাচ্ছে নাকি?'

বেচারামের আড়ষ্টতা কিছুটা কমে এসেছিল। বলল, 'হ্যাঁ বাবু।' সে আরও জানায়, ভ্যান রিকশার যাত্রীরা চারপাশের গ্রামের বাসিন্দা, মেলায় কেনাকাটা করতে চলেছে। আর তিন-চাকাওলা ভ্যানে যারা মালবোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে তারা দোকানদার। মেলায় তারা যাচ্ছে জিনিসপত্র বেচে দু'পয়সা কামাতে।

বেচারামদের ভ্যান রিকশার পাশাপাশি ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছে দিবাকরদের অ্যামবাসাডর। দিবাকর জিগ্যেস করলে, 'এই ঠাকুরবাবাটি কে?'.

বেচারাম ভক্তিভরে হাতজোড় করে কপালে ঠেকায়। তারপর আপ্লুত গলায় যা জানায় তা এইরকম। ঠাকুরবাবা একজন মহা সিদ্ধপুরুষ। তাঁর ছিল অলৌকিক ক্ষমতা। ডাক্তাররা যে সব রোগীকে জবাব দিয়েছে, ঠাকুরবাবার

কাছে নিয়ে গেলে তাঁর কৃপায় ওরা বেঁচে যেত। অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পেত। বাঁজা মেয়েমানুষ শ্বশুরবাড়ির গঞ্জনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, ভাবছে আত্মহত্যা করবে, ঠাকুরবাবার খবর পেয়ে তাঁর পায়ে গিয়ে পড়তেই ছেলেমেয়ে হতো। একবার এই অঞ্চলে প্রচণ্ড খরায় চারিদিক জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই, ফসলের মাঠ ফেটে চৌচির, বাতাসে আগুনের হলকা ছুটছে। ঠাকুরবাবার করুণায় শেষ অব্দি বৃষ্টি নামল অঝোরে। অন্য অন্য খারের তুলনায় ফসল ফলল বহুগুণ। প্রাণীজগৎ বেঁচে গেল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

দিবাকর ভাবলেন, সাধুসন্ন্যাসী নিয়ে মানুষের মুখে মুখে নানারকম মিথ তৈরি হয়। এও প্রায় তাই। তবু রীতিমতো কৌতূহল বোধ করছিলেন তিনি। বললেন, 'ঠাকুরবাবা কি এখনও বেঁচে আছেন?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে বেচারাম।—'না।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও প্রশ্ন করে দিবাকর জানতে পারেন, ঠাকুরবাবা নামে এই মহাপুরুষটি একশো বছর আগে হঠাৎ কোত্থেকে যেন এই এলাকার হৃদয়পুরে চলে আসেন। হৃদয়পুরের বিশাল এক মাঠের মাঝখানে প্রতিষ্ঠা করেন কালীমন্দির। প্রথম দিকে লোকজন তাঁর ত্রিসীমানায় ঘেঁষত না। পরে তাঁর অপার্থিব শক্তির খবর পেয়ে ভিড় জমতে লাগল। ঠাকুরবাবার ভক্ত আর অনুগতের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলল।

পঞ্চাশ বছর আগে অঘ্রান মাসের এই দিনটিতে দেহ রেখেছিলেন ঠাকুরবাবা। তাঁর তিরোধান উপলক্ষে হৃদয়পুরের কালীমন্দিরে সামনের মাঠে দু'দিন ধরে মেলা বসে। মন্দিরে ঠাকুরবাবার নাম করে পুজো দিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

দিবাকর জিগ্যেস করলেন, 'হৃদয়পুর জায়গাটা কোথায়?'

বেচারাম জানায়, হাইওয়ে ধরে আরও দু-আড়াই কিলোমিটার গেলে আড়াআড়ি একটা রাস্তা পড়বে। হাইওয়েটা গেছে পশ্চিম থেকে পুবে। অন্য রাস্তাটা উত্তর থেকে দক্ষিণে। ওই রাস্তাটা যেখানে হাইওয়েটা ভেদ করে চলে গেছে সেখান থেকে দক্ষিণে খানিকটা গেলেই হৃদয়পুর।

বেচারামের সঙ্গে দিবাকর কথা বলছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর অবাক চোখ বার বার ওদের ভ্যান রিকশায় সেই কালো পাথরের প্রতিমার মতো বালিকা

বধূ আর নতুন ধুতি জামা পরা কিশোরটির দিকে চলে যাচ্ছিল। বউটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিবাকর বলেন, 'এটি তোমার কে হয়?'

আগে বেচারাম জানিয়েছিল, ভ্যান রিকশায় যারা রয়েছে তারা তার পরিবারের লোকজন। আলাদাভাবে কারও পরিচয় টরিচয় দেয়নি। এবার বলল, 'আমার নাত-বউ কাজলি।' ভালমানুষ গোছের কিশোরটিকে দেখিয়ে জানায়, 'ও আমার নাতি ফটিক।' অন্যদের সম্বন্ধেও জানাল, না-যুবক না-প্রৌঢ় লোকটি তার ছেলে হরেন, বছর তিরিশের গিন্নিবান্নি ধরনের মেয়েমানুষটি ছেলের বউ, আর বৃদ্ধাটি তার স্ত্রী।

অন্য কারও সম্বন্ধে আগ্রহ নেই দিবাকরের। তিনি বললেন, 'ওইটুকু ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছ!'

বেচারাম হেসে হেসে বলল, 'এটাই তো বে'র বয়েস বাবু। আমার বাপ-ঠাকুদ্দা আরও কম বয়েসে বে' করেচে।' নিজের স্ত্রীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'ওই যে আমার পরিবারকে দেকচেন বে'র সোময় ও ছেল পাঁচ বচ্ছরের মেইয়ে, আমার ত্যাকন সাত।'

বেচারামের পরিবারের কপাল অব্দি ঘোমটা টানা ছিল। লহমায় সেটা গলা পর্যন্ত নামিয়ে কলা-বউ হয়ে যায়।

বেচারাম অল্প বয়সে বিয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে লম্বাচওড়া একখানা বক্তৃতা দেয়। দশ বারো বছরের ভেতর বিয়ে হয়ে গেলে ছেলেমেয়েরা পাশাপাশি বড় হয়ে ওঠে, তাদের মনের মিলমিশ হয়, অপার শান্তিতে সুখে তারা সংসার-ধর্ম পালন করে। ধাড়ী বয়সে বিয়ে হলে নিত্যদিন খিটিমিটি, অশান্তি। আসলে বয়স বাড়লে নিজস্ব মতামত গড়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রী কেউ কারও কাছে মাথা নোয়াতে চায় না। সব সংঘাতের উৎপত্তি সেখানে।

বিপুল স্নেহে নাত-বউকে এক পলক দেখে নিয়ে বেচারাম বলল, 'এই যে কাজলিকে দেখচেন, বড্ড দজ্জাল মেইয়েছেল। মাথায় রাগ চড়লে ফটকেকে আঁচড়ে কামড়ে চুল ছিঁড়ে রক্তারক্তি বাধিয়ে দেয়। সোয়ামী বলে ভ্রুক্ষেপ নেই। ফটকেটা এমনি ভেড়ুয়া যে মুখ বুজে মার খায়। বয়েস তো কম, কাজলি বোজে না সোয়ামী কী বস্তু। বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।' বলেই 'উ' করে কাতর শব্দ করে।

দিবাকর জিগ্যেস করেন, 'কী হল?'

বেচারাম বলল, 'কাজলির গুণকেত্তন করছিলুম বলে আমার উরুতে চিমটি কেটেচে।'

দিবাকর কাজলির দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। কাজলি লাল টুকটুকে সরু জিভ বার করে তাঁকে ভেংচে দিল। দিবাকরের বেশ মজাই লাগে। আবার বেচারামের দিকে মুখ ফেরান তিনি।—'একটা খবর তুমি জানো?'

'কী বাবু?'

'এত কম বয়েসে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়াটা বেআইনি। গভর্নমেন্ট টের পেলে তোমাদের জেল হয়ে যাবে।'

এমন রগড়ের কথা আগে কখনও বুঝিবা শোনেনি বেচারাম। আধবুড়ো লোকটা হেসে কুটিপাটি হয়ে যায়। বলে, 'গরমেন (গভর্নমেন্ট) আমাদের ঘণ্টা করবে। হেথায় যে বাড়িতেই যান, কচি কচি সোয়ামী-ইস্তিরি দেখতে পাবেন। এই অঘ্‌ঘান মাসে আমন ধান উটচে। ঘরে ঘরে একন মা-বাপেরা ছেলে মেইয়েদের বে' দেবার জন্যি উটে পড়ে নেগেচে। গরমেন ক'জনাকে ধরবে? অ্যাদ্দিনের নেয়ম উলটে দিলেই হল!'

'তা বটে। তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুব ভাল লাগল। চলি—' বলে মণিময়ের দিকে তাকালেন দিবাকর, 'এবার স্পিড তোল—'

গাড়ির গতি বাড়াতে বাড়াতে মণিময় বললেন, 'একটা গেঁয়ো লোকের সঙ্গে বক বক করে অনেকটা সময় নষ্ট করলেন দাদা। এতক্ষণে আমরা কত দূর চলে যেতে পারতাম।'

দিবাকর বললেন, 'শুধু শুধু কি করছিলাম! কোথায় যাব ঠিক ছিল না। ওর সঙ্গে গল্প করে আজকের মতো একটা ডেস্টিনেশন তো পাওয়া গেল।'

ঘাড় অল্প কাত করে মণিময় বললেন, 'ডেস্টিনেশনটা নিশ্চয়ই হৃদয়পুর মেলা?'

'এগ্‌জাক্টলি।'

'দাদা তো এতদিন গোলাগুলি, রাইফেল, মেশিনগান, ওয়ার—এই সব হার্ড রিয়ালিটি নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন। হঠাৎ শেষ বয়েসে সুপারন্যাচারাল ব্যাপার স্যাপারে ইন্টারেস্ট এসে গেল দেখছি। ওই গেঁয়ো লোকটা, কী যেন নাম—হ্যাঁ, বেচারাম মণ্ডল, আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করে ফেলল নাকি?'

'মানে?'

মণিময় বললেন, 'বেচারাম ঠাকুরবাবার নানা কাণ্ডকারখানার কথা বলল, আর আপনি ঠিক করে ফেললেন মেলায় যাবেন। তা মতলবটা কী আপনার?'

ভুরু সামান্য কুঁচকে গেল দিবাকরের।—'কীসের মতলব হে?'

'ওই সিদ্ধপুরুষটির নাম করে পুজো চড়ালে নাকি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। আমাদের আয়ু তো আর ছ' মাস। পুজো দিয়ে কয়েক বছরের জন্যে সেটা বাড়িয়ে নেবেন নাকি? এক্সটেনশন ফর আ ফিউ মোর ইয়ার্স।'

'মন্দ কী। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ মনে করে এমন অনেক কিছু আছে, সায়েন্স ফায়েন্সের বাপের সাধ্য নেই তার ব্যাখ্যা করতে পারে। সুপারন্যাচারালের খেলটা না হয় দেখাই যাক।' বলে হাসতে লাগলেন দিবাকর।

মণিময় এবং শুভেন্দু বুঝতে পারল, নেহাতই মজা করছেন দিবাকর।

খনিকক্ষণ চুপচাপ।

তার পর দিবাকরই ফের শুরু করেন, 'আরে বাবা, শুধু হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছোটালেই কি পাঁচটা দিন কেটে যাবে? সে জন্যে তো মানুষের কোম্পানি দরকার। মেলায় হাজার হাজার মানুষের গ্যাদারিং হবে। কত টাইপের মানুষ! দেখবে টাইম চমৎকার কেটে যাচ্ছে।' একটু থেমে বললেন, 'সেই ছেলেবেলায় ঠাকুরদা আমাকে দু-একবার মৌলালির রথের মেলায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেটা শহরের মেলা। গ্রামের মেলা কখনও দেখিনি।'

মণিময় জানালেন, বেনারসে থাকার সময় একবার প্রয়াগে গিয়ে কুম্ভমেলা দেখেছেন। শুভেন্দু জানায়, জীবনে আজ অব্দি সে কোনও মেলাই দেখেনি।

দিবাকর বললেন, 'যাক, হৃদয়পুর গেলে হয়তো নতুন কিছু এক্সপিরিয়েন্স হবে।'

মণিময় বললেন, 'ঠিক হ্যায়, চালাও পানসি হৃদয়পুরের দিকে।'

চার

মেলাটা ঠিক কোথায়, বেচারাম মণ্ডল জলের মতো তা বুঝিয়ে দিয়েছিল। হাইওয়েটাকে তেরছাভাবে চিরে যে রাস্তাটা চলে গেছে, সেটা ধরে ডাইনে খানিকটা যেতেই মেলায় পৌঁছনো গেল।

রাস্তা থেকে সামান্য নিচে বিশাল মাঠ। সেখানে এর মধ্যেই মেলা বসে গেছে। গ্রামের মেলা যেমন হয়, এটাও অবিকল তাই। কত রকমারি জিনিসের যে দোকান তার লেখাজোখা নেই। হাতা খুন্তি কড়াই বেলুন চাকি প্লাসটিকের বালতি, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ঘর গেরস্থালির জিনিস থেকে সস্তা আলতা স্নো পাউডার কাচের চুড়ি এমনি কত কিছু যে রয়েছে চারিদিকে। তা ছাড়া জামাকাপড়ের দোকান, তেলেভাজার দোকান, খাবারের দোকান—যেদিকেই তাকানো যাক দোকানে দোকানে মেলা চত্বর ছয়লাপ। কেউ তেরপলের ছাউনি বানিয়ে তার তলায় পসরা সাজিয়ে বসেছে, কেউ বসেছে খোলা আকাশের নিচে।

এর মধ্যে প্রচুর মানুষ এসে গেছে মেলায়। বুড়ো-ধুড়ো, বাচ্চাকাচ্চা, যুবক যুবতী থেকে নানা বয়সের মানুষজন। আরও আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। অনেক ভ্যান রিকশায় চেপে, অনেক স্রেফ পায়ে হেঁটে। বহু দোকানদারও আসছে তিন চাকার ভ্যানে মালপত্র চাপিয়ে। বিশাল চৌহদ্দি থেকে লক্ষ কোটি মাছির ভনভনানির মতো অবিরল আওয়াজ উঠে আসছে।

মেলার উত্তর দিকের শেষ মাথায় একটা মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। সেখানেই ভিড়টা সবচেয়ে বেশি।

রাস্তা থেকে অ্যামবাসাডরটা নিচে নামিয়ে দিবাকররা নেমে পড়লেন। তাঁর হাতে সেই লোহার মুঠ-বাঁধানো ছড়িটি রয়েছে। মণিময় গাড়িটা লক করে দেবার পর দিবাকর বললেন, 'চল। এই ভারতের জনসমুদ্রে মিশে যাওয়া যাক।'

এরকম গেঁয়ো মেলায় ঝকঝকে গাড়িতে চেপে দামি প্যান্ট-শার্ট পরা সাহেব মার্কা শহুরে মানুষেরা আসে না। অনেকে অবাক চোখে দিবাকরদের

দেখছিল। তবে দিবাকররা টের পাননি একটা লোক দূর থেকে চিলের দৃষ্টিতে তাঁদের লক্ষ করছিল। তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। রোগা, ক্ষয়াটে চেহারা। গাল ভাঙা, খাপচা খপচা দাড়ি। গর্তে ঢোকানো গোল চোখ। শরীরে মাংসের চেয়ে হাড় বেশি। গাঁটপাকানো আঙুল। থুতনিটা চোখা, কণ্ঠমণি ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। পরনে ময়লা পাজামা আর বেখাপ্পা ঢলঢলে জামার ওপর জেলজেলে হাফ-হাতা সোয়েটার। পায়ে তালি-মারা চটি। যেটা সব চেয়ে বেশি করে নজরে পড়ে তা হল লোকটার বাঁ পা'টা ডান পায়ের চেয়ে বিঘত খানেক ছোট।

দিবাকরদের দেখে কয়েক লহমা তার গোলাকার চোখ স্থির হয়ে থাকে। তারপর দু'হাতে ভিড় ঠেলে, ডান পায়ে বেশি ভর দিয়ে, বন বন করে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এগিয়ে আসে। দিবাকরদের সামনে ঘাড় ঝুঁকিয়ে হাতজোড় করে বলে, 'পেন্নাম সায়েবরা।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েচিলেন তিনজন। দিবাকর লোকটার পা থেকে মাথা অব্দি ধীরে ধীরে দেখে নিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কে তুমি?'

বশংবদ ভঙ্গিতে লোকটা জবাব দিল, 'আমি ভোবন—ভোবন দাস।'

ভোবন অর্থাৎ ভুবন। দিবাকর বললেন, 'আমাদের কাছে কী চাও?'

'আজ্ঞা, আপনারা মনে হচ্চে এই পেরথম ঠাকুরবাবার মেলা দেখতে এয়েচেন।'

'তা এসেছি।'

'য্যাতক্ষণ মেলায় ঘুরবেন, আমি আপনাদের সন্‌গে থাকতি চাই।'

'মতলবটা কী তোমার?' হাতের ছড়িটা উঁচিয়ে দিবাকর বললেন, 'এটা দেখছ তো। চোর ছ্যাঁচোড়দের টিট করার জন্যে এটা কাজে লাগাই। ওই তো চেহারা তোমার। দু'টো বাড়ি মারলে শিরদাঁড়া চুরমার হয়ে যাবে। এ জীবনে আর বিছানা থেকে উঠতে হবে না।'

ভুবন শিউরে ওঠে। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে থাকে, 'আমি ভদ্দর বংশের ছেইলে। চুরি জোচ্চুরি ঘেন্না করি। না খেইয়ে মরব তবু এসব লোংরা কাজ করতে পারব না।' ভুবন আরও জানায়, সে হতদরিদ্র। শরীরে শক্তি নেই, ভীষণ দুর্বল। তা ছাড়া পায়ে খুঁতের জন্য বর্তমানে বেশি খাটুনির কাজ করতে পারে না। একটুতেই হাঁপিয়ে পড়ে।

রীতিমতো কৌতূহল হচ্ছিল দিবাকরের। বললেন, 'তোমার তা হলে চলে কী করে?'

ভুবন জানালো, হাটে বাজারে মেলায় ঘুরে বেড়ায় সে। আড়তদার, দোকানদার এবং নানাজনের ফাই ফরমাস খ্যাটে। তাতে খাওয়া জুটে যায়। সেই সঙ্গে দু'চারটে টাকাও। তার পিছুটান নেই। ভাইরা বড়মানুষ, তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। সেও তাদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। তার নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। হাটের চালা বা কারও বাড়ির বাইরের বারান্দায় রাত কাটায়।

ডান ভুরুটা অনেকখানি উঁচুতে তুলে মণিময়দের দিকে তাকালেন দিবাকর।—'এ একেবারে মুক্তপুরুষ হে। পুরোপুরি আমাদের ক্লাসের। আমাদের তবু ব্যাঙ্কে কিছু পয়সাকড়ি আছে। এ পাক্কা ফকির।' বলেই ফের ভুবনের দিকে চোখ ফেরালেন।—'ঠিক আছে, তোমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলাম।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' শব্দটা ভুবনের অচেনা। সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

দিবাকর বুঝিয়ে বলেন, 'মেলায় তুমি হবে আমাদের গাইড়। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাবে। আমরা যা খাব তুমিও তাই খাবে। তা ছাড়া এক শ' টাকা ক্যাশ পাবে।'

সাহেব সুবোদের সঙ্গে ভরপেট খাওয়া, তার ওপর নগদ এক শ'টা টাকা! ভুবনের চোখে মুখে হাতে পায়ে বিজলি খেলতে থাকে। 'আসেন স্যারেরা, আসেন। এই হটো সব, হটো হটো—' শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে বন বন করে পা ফেলতে ফেলতে ভিড় ঠেলে ঠেলে দিবাকরদের সঙ্গে নিয়ে এগুতে থাকে। শহুরে ভদ্র লোকজনের সঙ্গে সামান্য মেলামেশার হয়তো সুযোগ পেয়েছে সে। 'স্যার' কথাটা তার জানা।

বিরাট একটা দায়িত্ব পেয়ে ভীষণ উত্তেজিত ভুবন। তার মুখে একটানা শুধু 'হটো, হটো—' দিবাকরদের দুর্লভ সঙ্গ পেয়ে মেলায় গেঁয়ো লোকজনদের সে পোকামাকড়ের মতো মনে করছে।

নানা দোকানপাটের পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে দিবাকরদের নিয়ে যেতে যেতে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকায় ভুবন।—'আগে কোতায় নে যাব?'

দিবাকর বললেন 'আমরা কি এখানে কখনও এসেছি? দেখার মতো কী আছে, কিছুই জানি না।'

'তবে মন্দিরেই চলেন—'

'মন্দির পরে হবে।'

'তা হলি, তা হলি—' ভুবন একটু চিন্তা করে বলে, 'পাখির বাজারেই যাই।'

দিবাকর একটু অবাক হলেন। তাঁর ধারণা ছিল, এই ধরনের গ্রাম্য মেলায় হাঁড়ি কড়া বালতি জাতীয় নানা জিনিস, সস্তা স্নো-পাউডার আর খাবার টাবার ছাড়া বিশেষ কিছুই মেলে না। জিগ্যেস করলেন, 'এখানে পাখিও পাওয়া যায়?'

'পাখি কী বলচেন স্যার, গরু ছাগল হাঁস মুরগি—সব বেচাকেনা হয়।'

ভুবনের সঙ্গে যেতে যেতে দিবাকরদের চোখে পড়ল, চারিদিকে জোড়া জোড়া বাচ্চা বর-বউ। মা-বাবা কি শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে মেলা দেখতে এসেছে। এরা বেচারাম মণ্ডলের নাতি-নাত বউ কি তাদের চেয়েও কমবয়সী হবে। বেচারাম বলেছিল, আমন ধান উঠলে এই অঞ্চলে কচি কচি ছেলেমেয়েদের বিয়ের ধুম পড়ে যায়। খবরটা দেখা যাচ্ছে ষোলআনা ঠিক।

মণিময় বললেন, 'মাই গড! এসব কী দেখছি দিবাকরদা! ওয়েস্ট বেঙ্গল তো জানি খুব প্রগ্রেসিভ স্টেট। এখানেও গৌরীদান চলছে!'

দিবাকর হাসলেন।—'আমিও এই স্টেট সম্পর্কে তাই জানতাম। 'লাইফ লাইন ক্যানসার হসপিটাল' থেকে না পালিয়ে এই সব মজা কি চোখে পড়তে হে?'

মণিময় ঘাড় কাত করলেন।—'তা ঠিক।'

'রুরাল ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কোথায় পড়ে আছে দেখ।'

পাখির বাজার নামেই। দু'জন মাত্র ব্যাপারী গোটা পাঁচিশেক খাঁচার ভেতর নানা ধরনের পাখি নিয়ে বসে আছে। মুনিয়া, টিয়া, ময়না, বুলবুলি—এমনি সব চেনা পাখি।

দুই পাখিওলার সঙ্গে নিজেরাই যেচে আলাপ করে নিলেন দিবাকররা। ওদের একজনের নাম রহমান, অন্যজন কার্তিক। দু'জনেরই বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। রহমানের গায়ের রং কালো কুচকুচে। ভারী ধরনের চেহারা। চওড়া কাঁধ, চৌকো মুখ, মাথায় পাতলা চুল। পরনে লুঙ্গি আর ডোরাকাটা

জামার ওপর রোঁয়াওলা সোয়েটার। কার্তিকের চেহারা রোগা, সিড়িঙ্গে মার্কা। অনেকটা বেউড় বাঁশের মতো। গায়ের রং বাদামি। বেঢপ লম্বা মুখ। কপালে ডুমো ডুমো মাংস। সরু থুতনি। পরনে ময়লা চাপা তালি-মারা পাজামা আর শার্ট। তার ওপর পাটকিলে রঙের চাদর জড়ানো।

দিবাকরদের মতো খদ্দের তাদের ধারেকাছে আসে না। রহমান আর কার্তিক রীতিমতো হকচকিয়ে যায়।

দিবাকর গম্ভীর মুখে বলেন, 'সরকার যে আইন করে পাখি বেচা বন্ধ করে দিয়েছে, সেটা জানো?'

'জানি সায়েব—' ঢোক গিলে রহমান বলে 'সরকার তো আইন বেনিয়েই (বানিয়েই) খালাস। পাখি না বেচলি আমরা কি উপোস দে মরব? কানুন বানানেই হল! মানুষ কী খাবে সেটি ভাবতে হবেনি?' একটু থেমে গলার স্বর ঝপ করে নামিয়ে দেয় সে।—'এই তো খানিক আগে এখেনকার থানার বড়বাবু এক জোড়া মুনিয়া কিনে নে' গেল। গরমেন পাখির কারবারের কথা জানে।'

দিবাকর কথা বলছিলেন ঠিকই, তবে তাঁর চোখ খাঁচার পাখিগুলোর দিকে বার বার চলে যাচ্ছে। অন্যমনস্কর মতো তিনি কিছু ভাবছিলেন।

এদিকে রহমান হাত কচলাতে কচলাতে বলে, 'আমাদের সব সস্তার পাখি। টিয়া মুনিয়া ফুনিয়া কি আপনাগের চলবে?'

পাখিগুলোর দিক থেকে চোখ সরাননি দিবাকর। আচমকা তাঁর মস্তিষ্কে যেন বিদ্যুৎ বয়ে যায়। ব্যস্তভাবে বললেন, 'চলবে চলবে, খুব চলবে। তোমাদের দু'জনের কাছে কতগুলো পাখি আছে? সব ক'টার কত দাম?'

রহমানেরা প্রথমটা থ হয়ে যায়। খদ্দের যারা আসে তারা একটা দু'টো পাখি কেনে। এই সাহেবরা কিনা সমস্ত পাখির দাম জানতে চাইছেন! মোটা লাভের একটা বড় রকমের সুযোগ হাতের মুঠোয় এসে গেছে বুঝিবা। অবাক ভাবটা কেটে গিয়ে দু'জনে তৎপর হয়ে ওঠে। তাদের হাতে পায়ে লহমায় চমকে খেলে যায়। পাখি গোনা শেষ করে নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কিছু একটা পরামর্শ করে নেয়। তারপর রহমান হাত কচলাতে কচলাতে বলে, 'সব মিলিয়ে তেত্রিশটা পাখি রয়েচে। তার ওপর ধরুন গে পাঁচিশটে খাঁচা। পাখি আর খাঁচার দর সাড়ে তিন শো। তবে—'

'তবে কী?'

'আপনারা হলেন গে সায়েব মানুষ। আমরা গরিব গুর্বো লোক। দু'টো পয়সা বেশি দেলে পেরানে (প্রাণ) আনন্দ পাই।'

'ঠিক আছে, কত চাইছ?'

টাকার অঙ্কটা কতখানি চড়ালে খদ্দের সরে পড়বে না, সেটা ভেবে উঠতে পারছিল না রহমান। তবে সে চতুর কারবারী। বলল, 'আপনি বিবেচনা করে যা দ্যান—'

দিবাকর বললেন, 'চারশো দেব। খুশি তো?'

একেবারে ডগমগ হয়ে যায় রহমান। বলে, 'খুব খুশি সায়েব। খুব খুশি। আপনাগের মেহেরবানিতে ক'টা দিন ছেলেপুলা নে নিচ্চিন্তি (নিশ্চিন্তে) কাটবে।'

এদিকে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন মণিময় আর শুভেন্দু। মণিময় বললেন, 'এত পাখি দিয়ে কী করবেন দিবাকরদা?'

'দেখ কী করি—' বলে পাখিওলাদের টাকা মিটিয়ে দিয়ে বললেন, 'একটা একটা করে খাঁচা আমার হাতে তুলে দাও—'

রহমান এবং কার্তিক পালা করে খাঁচা নিয়ে আসে।

সেগুলোর দরজা খুলে একের পর এক পাখি আকাশে উড়িয়ে দিতে থাকেন দিবাকর।

রহমানরা হতভম্ব। তারা হাঁ হা করে ওঠে। তড়বড় করে কী যেন বলতে থাকে। দিবাকর কানেও তোলেন না।

পয়সা খরচ করে পাখি কিনে কেউ এভাবে ছেড়ে দিতে পারে, এমন পাগলাটে খামখেয়ালি মানুষ আগে আর কখনও এ মেলায় আসেনি। দিবাকরকে ঘিরে ভিড় জমে যায়।

মণিময় এবং শুভেন্দু বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে এবার বলে ওঠেন, 'এ কী করছেন দিবাকরদা!'

পাখিগুলো উত্তুরে হাওয়ায় ডানা মেলে, আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে, রঙের ফোয়ারা ফুটিয়ে, মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে থাকে। সেদিকে চোখ রেখে দিবাকর বললেন, 'হাসপাতালের জেলখানা থেকে আমরা পালিয়ে এসেছি। ওদেরও খাঁচা থেকে মুক্তি দিলাম। বনের পাখি আবার বনে ফিরে

যাবে। আমাদের পলায়নের পর প্রথম স্মরণীয় ঘটনা। ফার্স্ট মেমোরেবল ইভেন্ট।'

সমস্ত পাখি উড়ে যাবার পর ফাঁকা খাঁচাগুলো পাখিওলাদের দিয়ে দিবাকর ভুবনকে বললেন, 'এই যে মিস্টার গাইড, এবার কী দেখাতে নিয়ে যাবে, চল—'

আগের মতোই ট্যারাবাঁকা ভঙ্গিতে, বন বন করে এগিয়ে চলল ভুবন। মুখে সেই 'হটো, হটো—' তার পেছন পেছন হাঁটতে লাগলেন দিবাকররা।

এক জায়গায় চাপবাঁধা বিরাট ভিড়। বহু মানুষ বৃত্তের আকারে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে।

দিবাকর জিগ্যেস করলেন, 'এখানে এত জটলা কীসের? কী হচ্ছে?'

ভুবন জানায়, 'এক সাধু বুক অব্দি মাটির ভেতরে গেড়ে পা ওপর দিকি তুইলে রইচে। দেকবেন স্যারেরা?'

'দেখা যাক।'

ভুবন ভিড়ের একটা অংশের লোকজন হটিয়ে দিবাকরদের জন্য জায়গা করে দিল। সে যা বলেছিল ঠিক তা-ই। রক্তবর্ণ লেঙট পরা এক সন্ন্যাসীর শরীরের ওপরের দিকের অর্ধেকটা মাটির তলায়, বাকি অংশটা শূন্যে। তার দুই চেলা, বয়স ছত্রিশ সাঁইত্রিশ, তাদেরও পরনে লাল লেঙট, ভস্মমাখা গা, মাথায় জটা—ঘুরে ঘুরে গুরুর মহিমাকীর্তন করছিল। হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে। ইনি শ্রীশ্রী মহারাজ ওঙ্কারানন্দ। পাওহারী বাবা। হাওয়া ছাড়া আর কিছু ভোজন করেন না। চার শ' সাল হিমালয়ে ধ্যান করে কাটিয়েছেন। জীবের কল্যাণের জন্য সমতলে নেমে এসেছেন। বাবার নামে পরমাত্মার সন্তোষের জন্য পুজো চড়ানো হবে। যে যা পার দান কর। বাবার করুণায় সবার মনোকামনা পূর্ণ হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। একটানা ঘ্যানঘেনে সুরে বলেই চলেছে তারা। তাদের দু'জনের হাতেই চটের থলে।

লোকজন যার যা সাধ্য, একটাকা দু'টাকার কয়েন কি পাঁচ টাকার নোট ভক্তিভরে কপালে ঠেকিয়ে চেলাদের থলেতে ফেলে দিচ্ছে।

চেলারা একসময় দিবাকরদের কাছে চলে আসে। একই সুরে পরমাত্মার তৃপ্তির জন্য থলের মুখটা বড় করে ফাঁক করে দান চায়।

দিবাকর জিগ্যেস করেন, 'ওহে চেলা বাবারা, তোমরা বলছ তোমাদের গুরুদেব হিমালয়ে চারশো বছর ধ্যান করেছেন। তাঁর বয়েস কত?'

'হোগা পান শো (পাঁচ শো), হাজার সাল—'

পাশ থেকে মণিময় বললেন, 'মাই গড, লোকটা বোধহয় স্বচক্ষে মহম্মদ বিন তুঘলক কি তৈমুর লংকে দেখেছে।'

শুভেন্দু মজার গলায় বলল, 'কে জানে, মনু আর পরাশরের সঙ্গে বসে হয়তো চা খেয়েছে, ব্রহ্মা আর মহাদেবের সঙ্গে লুডো খেলেছে।'

'যা বলেছ—' চোখ কুঁচকে শুভেন্দুর দিকে এক পলক তাকিয়ে একটু হেসে ফের চেলাদের দিকে মুখ ফেরালেন।— 'তা চেলা বাবারা, তোমাদের গুরুদেবের পায়ের গোছ আর উরু টুরু দেখে তো মনে হয় পঞ্চাশের বেশি বয়েস হয়নি।'

একজন চেলা তড়বড় করে বলে উঠল, 'যোগ বাবুসাহাব, যোগ। মন দিয়ে যোগ করলে জওয়ানিকে হাজার দো হাজার সাল ধরে রাখা যায়। আমাদের গুরুদেব ভগবানকা অবতার। উনি সব কুছ পারেন। দান দিজিয়ে—'

'তোমাদের প্রভু ব্রিদিং কনট্রোলটা ভালই শিখেছে। মাটির তলায় মাথা ঢুকিয়ে রাখা সহজ ব্যাপার নয়। এই নাও—' দশ টাকার একটা নোট বার করে চেলাদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

দুই চেলার চোখেমুখে হতাশা ফুটে ওঠে। একজন বলে, 'ইতনা কম!'

দশ টাকা পকেটে ঢুকিয়ে একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করেন দিবাকর। চেলারা জোরে জোরে মাথা ঝাঁকায়।—'আপলোগ ইতনে বড়ে আদমি। আধা নেই, পুরা বাবুসাহাব—'

পঞ্চাশের বদলে এক শ' টাকার একটা নোট চেলাদের থলেতে ফেলে দিবাকর জিগ্যেস করেন, 'এবার পরমাত্মার সন্তোষ হবে তো?'

চেলাদের চোখেমুখে খুশির ঝিলিক খেলে যায়।— 'বহুৎ সন্তোষ হোগা, বহুৎ সন্তোষ—'

•

সাধুদর্শনের পর দিবাকর ভুবনকে বললেন, 'সাধুকা খেল তো দেখালে, এবার কী দেখাবে?'

'চাক্কুকা খেল। আসুন স্যারেরা—' ফের বন বন করে হাঁটতে হাঁটতে ভুবন যেখানে দিবাকরদের নিয়ে এল সেখানে অনেকটা জায়গা তেরপল দিয়ে ঘেরা। একটা ক্লাউনের মতো লোক, মাথায় ছুঁচলো টুপি, পরনে নানা রঙের ছিট জুড়ে জুড়ে বেখাপ্পা ঢোল্লা প্যান্ট আর জামা— মুখে লম্বা একটা চোঙা লাগিয়ে চেরা চেরা গলায় সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে।—'আইয়ে আইয়ে। চাক্কুকা খেল দেখিয়ে। দিলকা ধড়কন বন্ধ্ হো যায়েগা। অ্যায়সা খেল কভি নেহী দেখা। টিকট সিরিফ তিন রুপাইয়া।'

ভেতরে ঢোকার গেটের মুখে বড়সড় একটা জটলা। চাক্কুকা খেল দেখার জন্য রীতিমতো ভিড় জমে গেছে।

দিবাকররা তিনজন এবং ভুবন—মোট চারখানা টিকেট কেটে তাঁরা ঢুকে পড়লেন। হৃৎস্পন্দন সত্যিসত্যিই বন্ধ হয়ে যায় কিনা সেটাই দেখতে চান। তা ছাড়া, খানিকটা সময়ও কেটে যাবে।

দূরে উঁচু একটা মঞ্চ। সেটার সামনের দিকে দর্শকদের বসার জন্য কয়েক সারি বেঞ্চ।

যারা খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করেছে, দিবাকরদের দেখে তারা ভীষণ উত্তেজিত। এ ধরনের সাহেবমার্কা দর্শক শহর থেকে বহুদূরের গ্রাম্য মেলায় তাদের খেলা দেখতে আসবে, এ প্রায় অভাবনীয়। মঞ্চের একেবারে কাছাকাছি কিছু লোক বসে ছিল, তাদের পেছন দিকে পাঠিয়ে দিবাকরদের বসানো হল।

মঞ্চের এধারে সস্তা শালুর পর্দা ঝুলছিল। সিটগুলোতে দর্শক বোঝাই হয়ে গেলে পর্দা উঠল। প্রথমটা মঞ্চ একেবারে ফাঁকা। দর্শকদের সোজাসুজি মঞ্চের পেছন দিক ঘেঁষে একটা মস্ত তেপায়া কাঠের বোর্ড দাঁড় করানো রয়েছে শুধু। সেটার দু'ধারে দুটো বাল্ব জ্বলছে।

দিবাকর ভুবনকে জিগ্যেস করলেন, 'এখানে ইলেকট্রিক লাইট এসে গেছে?'

ভুবন জানায়, 'না স্যার, বড় রাস্তা দিয়ে খুঁটি পুঁতে লাইটের তার টেইনে নে গেচে গরমেন। সেকেন থিকে হুকিং করে সব্বাই বিজলি বাতি জ্বালায়।'

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যেই ঢোলা ঢোলা রঙচঙে জামা-প্যান্ট পরা তিনটে

লোক বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মঞ্চে এসে হাজির। তাদের কারও হাতে সেকেলে ক্ল্যারিওনেট, কারও হাতে বিশাল আকারের করতাল, কারও গলায় বাঁধা পেল্লায় ঢোলক বুকের ওপর ঝুলছে। তিন বাজনদার বিপুল উৎসাহে বজিয়ে চলেছে। প্যাঁপোর পো প্যাঁপোর পো, ঢ্যাপর ঢ্যাপর ইত্যাদি নানা আওয়াজে চারিদিক সরগরম করে তুলল তারা। বোঝা যাচ্ছে, আসল খেলা শুরু হবার আগে বেশ একটা জমকালো আবহাওয়া তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে।

বাজনদারেরা তাদের কেরামতি দেখিয়ে চলে যাবার পর তিনজন মঞ্চে ঢুকল। দু'জন পুরুষ এবং একটি যুবতী। মেয়েটির পরনে টাইট প্যান্ট আর লম্বা হাতাওলা জামা। পোশকটা তার গায়ে সেঁটে আছে। পুরুষ দু'জনের পরনে কালো চোঙা ধরনের প্যান্টের ওপর চুমকি বসানো জ্যাকেট। এরা একটা বড় স্টিলের ট্রাঙ্ক ধরাধরি করে এনে মঞ্চের একধাবে নামিয়ে রেখেছে। তাদের বয়স তিরিশের বেশি হবে না। দু'জনের মধ্যে যে বেশি লম্বা চওড়া সে একেবারে মঞ্চের সামনের দিকটায় এসে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। অন্য যুবকটি মেয়েটাকে নিয়ে পেছন দিকের কাঠের বোর্ডে ঠেসান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর স্টিলের বাক্স খুলে চোদ্দ পনেরোটা ছোরা বার করে বাক্স বন্ধ করে সেটার ডালার ওপর পর পর সাজিয়ে রাখল। ছোরাগুলো সমান মাপের, আট ন'ইঞ্চির মতো লম্বা, ফলা ঝকঝকে। দেখেই বোঝা যায় ভীষণ ধারাল। প্রত্যেকটার মুখ খুব সরু এবং তীক্ষ্ণ।

মঞ্চের সামনে যে যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে খুব সম্ভব সে-ই আসল খেলোয়াড়। গেটের বাইরে যে লোকটা চোঙা মুখে 'চাক্কুর খেল'-এর গুণকীর্তন করছিল, অবিকল সেই কথাগুলোই গমগমে গলায় বলে গেল সে। ভূ-ভারতে এমন খেলা কেউ কখনও দেখেনি, কোনও দিন দেখবেও না। এ খেল ভীতুদের জন্য নয়, দেখতে দেখতে দম আটকে যাবে; ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ টানা বক্তৃতার তুবড়িবাজি ছুটিয়ে সে খেলা শুরু করল। মেয়েটা কাঠের বোর্ডের গায়ে একেবারে লেপ্টে গিয়ে চোখ বুজে আছে। আর লম্বা খেলোয়াড়টি তার থেকে প্রায় বারো চোদ্দ ফিট দূরত্বে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

অন্য যুবকটি তার হাতে একের পর এক ছোরা তুলে দিতে লাগল। সে নির্ভুল নিশানায় ছুড়তে লাগল। মেয়েটির শরীরের চারপাশে, পা থেকে মাথা অব্দি, ছোরাগুলো গেঁথে যেতে লাগল। দু-তিন ইঞ্চি এদিক ওদিক হলে ছুরির ফলা যুবতীর গা ভেদ করে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেত। কিন্তু খেলোয়াড়টি এমনই নিপুণ, এই খেলায় এতটাই অভ্যস্ত যে লেশমাত্র ভুলচুক হয়নি। দিনের পর দিন নিশ্চয়ই একই খেলা দেখিয়ে যাচ্ছে সে।

শরীরের সমস্ত পেশী আর স্নায়ু টান টান করে ছোরা ছুড়ছে খেলোয়াড়টি। এবার স্নায়ুগুলো যেন আলগা আলগা হয়ে যাচ্ছে। কপালে দানা দানা ঘাম জমেছে। যুবতীটির হালও প্রায় একই রকম। মারাত্মক শো'য়ের পর ঘামে তার জামা প্যান্ট জবজবে হয়ে গেছে। জোরে জোরে শ্বাস টানছিল তারা। হাপরের মতো বুক ওঠানামা করছে।

দিবাকর ভাবছিলেন, দিনের পর দিন ছোরা ছুড়তে হয় যুবকটিকে। আর কাঠের বোর্ডের গায়ে ঠেসান দিয়ে চোখ বুজে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে যুবতীটি। নেহাত পেটের জন্য জীবনকে বাজি ধরে প্রতি মুহূর্তে দু আঙুলে মৃত্যু নিয়ে খেলছে। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে কত কিছুই না করতে হয়!

দর্শকরা দমবন্ধ করে আচ্ছন্নের মতো বসে ছিল। বিহ্বল ভাবটা কেটে যাবার পর সবাই উঠে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাততালি দিতে দিতে তারিফের সুরে চেঁচাতে থাকে।—'শাবাশ! কী দেখলাম গ'! পয়সা উশুল হইয়ে গেচে—'

দিবাকরের পাশ থেকে মণিময় বলে ওঠেন, 'সিনেমায় নাইফ থ্রোয়িং দেখেছি কিন্তু তার মধ্যে ক্যামেরার নানা কারসাজি থাকে। কিন্তু এ একেবারে খাঁটি জিনিস। এত লোকের চোখের সামনে এমন ভয়ঙ্কর খেলা দেখানো ভেরি, ভেরি ডিফিকাল্ট। কী কনসেনট্রেশন লোকটার, আর মেয়েটার কী সাহস! এরা রিয়াল আর্টিস্ট—'

অভিভূত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না মণিময়। পায়ে পায়ে মঞ্চের কাছে এগিয়ে যান। পকেট থেকে তিনখানা একশো টাকার নোট খেলোয়াড়টিকে দিয়ে বললেন, 'তোমাদের খেলা দেখে খুব খুশি হয়েছি। তুমি ওস্তাদ খেলোয়াড়—' মাথা পিছু মাত্র তিন টাকার টিকেটে এই

মারণখেলা দেখায় তারা। সেখানে একজন দর্শক তিন শো টাকা বকশিস দিচ্ছে। কড়কড়ে নোটগুলো হাতে নিয়েও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না যুবকটি। বিমূঢ়ের মতো কয়েক লহমা সে তাকিয়ে থাকে। তারপর কোমর ঝুঁকিয়ে বার বার কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে বলতে থাকে, 'নমস্তে সাহাব, নমস্তে। আপলোগকা বহুৎ বহুৎ কিরপা।'

পরের শো'য়ের সময় হয়ে এসেছিল। দিবাকররা বাইরে বেরিয়ে এলেন। আর তখনই মাইকে গান ভেসে এল। মনে হয় পুরনো রেকর্ড। বহুবার বাজানোর কারণে কিছুটা ঘষা ঘষা আর কর্কশ শোনাচ্ছে। তবু বোঝা গেল কালীকীর্তনের রেকর্ড।—'মায়ের পায়ে জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন—'

দিবাকররা যখন 'চাক্কুকা খেল' দেখতে ঢোকেন, এই গান শোনা যায়নি। এখনই বোধহয় রেকর্ডটা চালানো হয়েছে।

দিবাকর ভুবনকে জিগ্যেস করলেন, 'কোথায় গান বাজছে?'

ভুবন ডান দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।—'মা কালীর মন্দিরে। ওই যে—'

দিবাকর দেখতে পেলেন, মন্দিরের সামনের দিকের বিশাল মাঠটায় থিকথিকে ভিড়। বললেন, 'ঠাকুরবাবার মেলায় এসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দির দেখব না, তাই কখনও হয়। নাউ আওয়ার ডেস্টিনেশন ইজ কালী টেম্পল। চল—'

বেলা চড়ে গেছে অনেকটাই। সূর্য সোজাসুজি মাথার ওপর উঠে এসেছে। উত্তুরে বাতাসে সকালের দিকের সেই শীত শীত ভাব আর তেমনটা নেই। দিনের তাপাঙ্ক বেড়েছে বেশ খানিকটা। শরীর উষ্ণ মধুর রোদ থেকে আরাম শুষে নিচ্ছে।

কালী মন্দিরে এসে দেখা গেল এলাহি ব্যাপার। সারা মেলা যেন সেখানে ভেঙে পড়েছে। মাঠে লাইন দিয়ে বসিয়ে মহা মহারোহে ভোগ খাওয়ানো চলছে।

দিবাকর লক্ষ করলেন, শালপাতার থালায় খিচুড়ি, বেগুন ভাজা, পাঁচমেশালি একটা তরকারি আর একটু পায়েস—ওই হল ভোগের ব্যবস্থা। পরম ভক্তিভরে লোকজন তাই খাচ্ছে।

সেই কোন সকালে পাউরুটি চিজ দিয়ে ব্রেকফাস্ট করেছিলেন। চারিদিকে নানা কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে খাওয়ার কথা আর খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ভোগ খাওয়া দেখে পেটের ভেতর খিদেটা চনচন করে ওঠে।

দিবাকর মণিময়দের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করেন, 'কি হে, তোমাদের খিদে টিদে পায়নি?'

মণিময় বললেন, 'লাঞ্চের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। খিদে পাবে না?'

'তা হলে এখানেই বসে পড়া যাক।'

'মানে?'

'মা কালীর প্রসাদ খাব।'

মণিময় হতভম্বের মতো কয়েক লহমা তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, 'প্রসাদ হোক আর যা-ই হোক, মোটা আতপ চালের খিচুড়ি তো। এই জিনিস খাবেন! স্ট্রেঞ্জ!'

মণিময়ের কাঁধে একখানা হাত রেখে ভুরু নাচিয়ে হাসেন দিবাকর।—'আরে বাবা, এতকাল ফাইভ-স্টার হোটেল কি 'পশ' ক্লাবে, বড় বড় রেস্তোরাঁয় দামি দামি ডিনার আর লাঞ্চ খেয়েছ। একদিন চেখে দেখ না, দেশের নাইনটি পারসেন্ট মানুষ কী ধরনের খাবার খায়। ভোগ বলে খিচুড়ি হয়েছে, বাড়িতে এই সস্তা চালেরই ভাত জোটে না তাদের।' মণিময়ের কাঁধে হালকা চাপড় মারতে মারতে বলতে লাগলেন, 'আজকের দিনটা নিজেদের পাস্ট, নিজেদের সোশাল স্টেটাস ভুলে, পিপলের সঙ্গে মিশে যাওয়া যাক না।' ভুবনকে বললেন, 'যাও তো গাইড বাবু, আমাদের তিনজনের জন্যে ভোগ নিয়ে এস। তোমার জন্যেও এনো। কত দাম দিতে হবে জানো?'

ভুবন ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সেই সঙ্গে চরম হতাশও। দিবাকর বলেছিলেন, দুপুরের খাওয়াটা একসঙ্গে খাবেন। রাজকীয় একখানা ভোজ হবে, এই আনন্দে বিভোর হয়ে ছিল ভুবন। তার বদলে কিনা ট্যালটেলে খিচুড়ি, কচুঘেঁচুর ঘ্যাট, আর ফ্যানের মতো পায়েস! সে প্রায় মরিয়া হয়ে ওঠে।—'স্যার, মেলায় খুব ভাল হোটেল আছে। মাছ, খাসির মাংস, ডিম, যা খেতি চাইবেন সব পাবেন। সেকেনেই বরং চলেন—'

দিবাকর হুঙ্কার ছাড়লেন।—'ভোগ ফেলে হোটেলে যাব? যাও, প্রসাদ নিয়ে এস—' একখানা একশ' টাকার নোট পকেট থেকে বার করেছিলেন, সেটা ভুবনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিল ভুবনের। খুবই ম্রিয়মাণ।—'একেনে ভোগের জন্যি পয়সা লাগে না—' বলে আগের মতো বন বন করে নয়, বিমর্ষভাবে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলে গেল সে।

মাঠে শ'য়ে শ'য়ে মানুষের পাশে থেবড়ে বসে পড়লেন দিবাকর। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল ভুবন। তার দুই হাতে শালপাতার চারখানা থালা বোঝাই ভোগের প্রসাদ। তার সঙ্গে আরও একজন এসেছেন। বয়স সত্তর বাহাত্তর। গায়ের রং তামাটে, চুল ধবধবে সাদা। শান্ত, সৌম্য চেহারা। পরনে ধুতি ছাড়া অন্য কিছু নেই। গলায় একগোছা মোটা পৈতে। তাঁকে দেখামত্র মন সম্ভ্রমে ভরে যায়।

ভুবন পরিচয় করিয়ে দিল। তিনি কালী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। তিরিশ বছর এখানেই নিষ্ঠাভরে নিত্যদিন দেবীর পুজো করে আসছেন। নাম জগন্নাথ তর্কভূষণ।

জগন্নাথ বললেন, 'ভুবনের কাছে আপনাদের কথা শুনে চলে এলাম। ও ভোগ নিয়ে এল ঠিকই। কিন্তু আমার মন খুঁত খুঁত করতে লাগল। আপনাদের মাঠে বসে খেতে কষ্ট হবে। মন্দিরে চলুন। সেখানে চমৎকার ব্যবস্থা আছে। আরাম করে খেতে পারবেন।'

দিবাকর হাসলেন,—'এখানে এত লোক রয়েছে। তাদের পাশে বসে খেতে খুব ভাল লাগবে। আপনি আমাদের জন্যে অকারণ চিন্তা করছেন।' ভুবনকে বললেন, 'দাও হে।'

অগত্যা ভোগের তিনটে থালা তিনজনকে দিয়ে ভুবন তার নিজেরটা নিয়ে একটু দূরে বসে পড়ল।

যতক্ষণ খাওয়া চলল, কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন জগন্নাথ। মেলায় এই বিচিত্র তিন আগন্তুক সম্পর্কে তাঁর অপার কৌতূহল। দিবাকররা কোথায় থাকেন, কী করেন, আচমকা মেলায় চলে এলেন কেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এমন নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের ভাসা ভাসা জবাব দিয়ে গেলেন দিবাকর।

মন্দির চত্বরে একটা টিউবওয়েল রয়েছে। খাওয়া শেষ হলে সেখানে আঁচিয়ে জগন্নাথকে আড়াই শো টাকা দিয়ে দিবাকর বললেন, 'ঠাকুর মশাই, এটা পুজোর জন্যে রইল। চলি—'

জগন্নাথ হয়তো ক্ষুণ্ণ হলেন।—'একবার মন্দিরে গিয়ে প্রতিমা দর্শন করবেন না?'

'মা কালী যখন টানবেন, নিশ্চয়ই যাব।' বলে ভুবনের দিকে মুখ ফেরালেন দিবাকর।—'আমরা এখন গাড়িতে যাচ্ছি। তুমি তিনটের সময় চলে এস।'

তিনজন মেলার দোকানপাটের পাশ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চললেন। টিউবওয়েলের জলে মুখ ধোওয়া যায় কিন্তু খাওয়া চলে না। ব্যাকটেরিয়া ট্যাকটেরিয়া থাকতে পারে। তাঁরা ক্যানসারের পেশেন্ট। সঙ্গে করে তাই বেশ ক'টা মিনারেল ওয়াটারের বোতল নিয়ে এসেছেন। এখন গাড়িতে ফিরে জল খাবেন, ওষুধ খাবেন। সেই সকাল থেকে প্রথমে মোটরে, তারপর পায়ে হেঁটে প্রচুর ঘোরাঘুরি গেছে। তিনজনেই ভীষণ ক্লান্তি বোধ করছিলেন। এখন বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম খুবই জরুরি।

গাড়িতে ফিরে এসে ওষুধ টোষুধ খেয়ে সিটে পিঠ হেলিয়ে দিয়ে সবে চোখ বুজেছেন, দিবাকরের মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

ধড়মড় করে সোজা হয়ে উঠে বসলেন দিবাকর। তিথি দু-একদিন পর পর পুনে থেকে ফোন করে তাঁর খোঁজ-খবর নেয়। সে-ই কি?

মোবাইলটা কানে ঠেকাবার আগে কলার্স আইডেনটিটিটা লক্ষ করেন নি দিবাকর। করলে সঙ্গে সঙ্গে সুইচ অফ করে দিতেন। 'হ্যালো'—বলতেই ওধার থেকে 'লাইফলাইন ক্যানসার হসপিটাল'-এর সুপার ডাক্তার স্মিথের গলা ভেসে আসে, 'আমি কি কর্নেল লাহিড়ির সঙ্গে কথা বলছি?'

মানুষটি মৃদুভাষী, খুব ধীরে ধীরে কথা বলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে ডাক্তার স্মিথের কণ্ঠস্বর জবরদস্ত আর্মি অফিসার দিবাকর লাহিড়িকে রীতিমতো কাঁপিয়ে দেয়। টের পান, বুকের ভেতর দমাদ্দম হাতুড়ি পেটার মতো কিছু চলছে। মোবাইল ফোন খুবই কাজের। কিন্তু সেটা যে ভয়ানক বিপজ্জনকও, যত দূরেই যাওয়া যাক, যন্ত্রটা চালু থাকলে লহমায় ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা, তা আগে মাথায় আসেনি। এত আটঘাট বেঁধে, প্রচুর ছকটক কষে

তাঁরা হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছেন! ভেবেছিলেন সমস্ত পরিকল্পনাটা একেবারে নিশ্ছিদ্র, কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। কিন্তু সামান্য একটু ভুলে সব ভেস্তে যাবার জোগাড়।

গলা শুকিয়ে খরখরে হয়ে গিয়েছিল দিবাকরের। ঢোক গিলে কোনও রকমে বললেন, 'হ্যাঁ, স্যার—'

ডাক্তার স্মিথ বলেন, 'আপনি একজন ডিসিপ্লিনড আর্মি অফিসার। হাসপাতালের নিয়মশৃঙ্খলা ভাঙবেন, এটা আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভাবতেও পারে না। আমরা অবাক যতটা হয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি মর্মাহত।'

'না স্যার, না স্যার—' ছেলেমানুষের মতো একটা পলকা কৈফিয়ত খাড়া করার চেষ্টা করলেন দিবাকর, 'হাসপাতালের রুলস বা ডিসিপ্লিন ভাঙার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই। এই ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়েছিলাম। মানে—'

তাঁকে থামিয়ে দিলেন ডাক্তার স্মিথ।—'আপনি শুধু একাই যাননি। যতদূর জানতে পেরেছি, সঙ্গে করে মণিময় সরকার আর শুভেন্দু বসুকেও নিয়ে গেছেন। সকাল থেকে আমাদের সব স্টাফ আর সিকিউরিটির লোকেরা এত বড় হাসপাতাল তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে কিন্তু কোথাও আপনাদের পাওয়া যায়নি।' বুঝতেই পারছেন কী প্রচণ্ড টেনশনের মধ্যে আমাদের কেটেছে।'

তিনটি পেসেন্টের সন্ধান নেই। আচমকা তারা উধাও হয়ে গেছে। আন্দাজ করা যায় বিশাল হাসপাতাল এই নিয়ে তোলপাড়। কিন্তু ডাক্তার স্মিথের কণ্ঠস্বরে এতটুকু উত্তেজনা নেই। যেভাবে কথা বলেন হুবহু তেমনি ধীর, শান্ত, অচঞ্চল।

ভেতরে ভেতর গুটিয়ে যান দিবাকর। মিনমিনে গলায় বলেন, 'হ্যাঁ স্যার, আমাদের সব দায়িত্ব আপনার ওপর। টেনশন হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।'

'আপনাদের এমন দুর্মতি কেন হল, বুঝতে পারছি না। সে যাক, কখন ফিরে আসছেন?'

'ফিরব স্যার। খুব তাড়াতাড়ি—'

'এখন দু'টো বেজে দশ। কখন আপনাদের এক্সপেক্ট করতে পারি?'

জবাব দিতে গিয়ে থমকে যান দিবাকর। ডানা মেলে বাধাবন্ধহীন মুক্ত আকাশে ইচ্ছামতো ওড়ার জন্য তাঁরা বেরিয়ে পড়েছেন। এই আনন্দভ্রমণ চলবে পাঁচ দিন ধরে। কিন্তু ডাক্তার স্মিথকে তা বলা যায় না। ভাসা ভাসা ভাবে ফের আগের উত্তরটাই দিলেন, 'যত তাড়াতাড়ি পারি চলে আসব। না এসে যাব কোথায়?'

ডাক্তার স্মিথ হয়তো কিছু ভাবলেন। মুখ দেখতে না পাওয়ার জন্য সেটা অনুমান করে নিতে হল। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন, 'কর্নেল লাহিড়ি, আপনাদের রোগ কোন স্টেজে রয়েছে তা জানিয়ে দিয়েছি। কত সাবধানে আপনাদের হাসপাতালে রাখা হয় সেটাও আপনারা জানেন। এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে বেরিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি। অনিয়ম আর বাড়াবাড়ি করলে অনেক আগেই মহা বিপদ ঘটে যাবে। নিজেদের সর্বনাশ করবেন না।'

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছেন দিবাকর। ডাক্তার স্মিথ তাঁদের হিতাকাঙ্ক্ষী। ছ'মাস পর যে অনিবার্য ঘটনাটি ঘটতে চলেছে তা যাতে তীব্র কষ্টদায়ক না হয় সে জন্য হাসপাতালের দিক থেকে সেবাযত্নের কোনও ত্রুটি নেই। ঠিক সময়ে খাওয়া, ঘুম, বেড়ানো, ওষুধ—এইভাবে শারীরিক ক্লেশ যতখানি কমিয়ে রাখা যায় সেদিকে নার্স এবং ডাক্তাররা সারাক্ষণ লক্ষ রাখেন। দিবাকরদের বার বার জানানো হয়েছে, এসবের এতটুকু হেরফের হলে অসহ্য যন্ত্রণা চাড়া দিয়ে উঠবে। তবু কেন, কোন উদ্দেশ্যে তাঁরা বেরিয়ে পড়েছেন তা তো ডাক্তার স্মিথকে জানানো যায় না। তিনি চুপ করে থাকেন।

ডাক্তার স্মিথ জিগ্যেস করলেন, 'আপনারা এখন কোথায় রয়েছেন? যদি বলেন তো হাসপাতালের গাড়ি পাঠিয়ে আপনাদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি।'

দিবাকর যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেলেন। তাঁরা ঠাকুরবাবার মেলায় ঘুরে ঘুরে হাজার মজায় মশগুল হয়ে আছেন, জনতার সঙ্গে বসে ভোগ খেয়েছেন,

এসব জানালে ডাক্তার স্মিথের নির্ঘাত স্ট্রোক হয়ে যাবে। বললেন, 'না না স্যার, আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে।'

গাড়ি কোত্থেকে দিবাকররা জুটিয়ে নিয়েছেন তা আর জানতে চাইলেন না ডাক্তার স্মিথ। বললেন, 'ঠিক আছে, চলে আসুন। এসেই কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করবেন।' একটু থেমে ফের অনুযোগের সুরে বলেন, 'লাইফলাইন ক্যানসার হসপিটাল'-এর সেভেনটি ফাইভ ইয়ার্সের হিস্ট্রিতে এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল। আপনারা যা করলেন তাতে অন্য পেশেন্টরা খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠবে। এরপর তারা নিয়ম ভাঙলে তাদের দোষ দেওয়া যাবে না।'

ডাক্তার স্মিথ যে কতখানি ক্ষুব্ধ এবং বিচলিত তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না দিবাকরের। এই শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষটিকে চরম অস্বস্তিতে ফেলার জন্য ভীষণ খারাপ লাগছিল তাঁর। বিব্রতভাবে বললেন, 'স্যার, আমাদের অন্যায় হয়ে গেছে। ক্ষমা করবেন। ভবিষ্যতে আর কখনও এ ধরনের কিছু ঘটবে না।'

'ঠিক আছে, এখন ছাড়ছি।' ডাক্তার স্মিথ লাইন কেটে দিলেন।

হেমন্তের দিন ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। বাতাসে এর মধ্যেই মিহি হিম মিশতে শুরু করেছে। বেশ শীত শীত লাগছে কিন্তু কপালে দানা দানা ঘাম জমে গেছে দিবাকরের। দু' দু'টো যুদ্ধ করেছেন তিনি। ডাক্তার স্মিথ একটি কটু কথা বলেননি, একটুও উত্তেজিত হননি। তবু মনে হচ্ছিল কার্গিল বা বাংলাদেশ যুদ্ধের চেয়েও হাজার গুণ বড় একটা লড়াই তাঁকে করতে হয়েছে। রীতিমতো অবসাদ বোধ করছিলেন তিনি। মোবাইলের সুইচ অফ করে কিছুক্ষণ শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে থাকেন। তারপর খানিকটা ধাতস্থ হয়ে বলেন, 'ডাক্তার স্মিথ আমার নার্ভগুলো শ্যাটার করে দিয়েছেন। হাসপাতাল থেকে ভেগে পড়েছি। ভাবলাম, রবীন্দ্রনাথের সেই ছিন্নবাধা পলাতক বালক হয়ে গেছি। কিন্তু ডাক্তার স্মিথের কাছে আমাদের মোবাইল নাম্বারগুলো যে দিয়েছিলাম, মনেই ছিল না।'

ডাক্তার স্মিথের সঙ্গে দিবাকরের একতরফা কথা থেকে মোটামুটি সবটাই আঁচ করে নিয়েছিলেন মণিময়রা। তাঁরা জানতে চাইলেন, এবার কী করা উচিত।

দিবাকর ফের তাঁর স্বাভাবিক মেজাজে ফিরে এলেন।—'কী আবার করব, পানসি যেমন চলছে তেমনি চলবে। পাঁচদিনের এক্সপিডিশনে বেরিয়েছি। তার আগে ফেরার কোনও প্রশ্নই নেই। আমরা সবাই মোবাইল অফ করে রাখব। যদি কারও সঙ্গে কথা বলতেই হয়, 'অন' করে কাজ শেষ হল সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে রাখব।'

মণিময় হেসে হেসে রগড়ের সুরে বললেন, 'তার মানে ডাক্তার স্মিথ যাতে আর ছুঁতে না পারেন তার ব্যবস্থা?'

'এগ্‌জাক্টলি।'

পাঁচ

ভুবন তক্কে তক্কে ছিল। কাঁটায় কাঁটায় তিনটেয় বন বন করে চলে এল।—'স্যারেরা, সোময় হয়ে গেচে। বারোবেন (বার হবেন) তো?'

ডাক্তার স্মিথের ফোন আসায় সেভাবে বিশ্রাম হয়নি। তবু দিবাকর বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' আসলে হাতে পাঁচ দিন মোটে সময়। এর ভেতর যা কিছু, যত কিছু দেখে নেওয়া যায়।

গাড়ি 'লক' করে ফের তিনজন ভুবনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। মেলা এখন দারুণ জমে উঠেছে। চারিদিক গম গম করছে।

মেলার একধারে বিশাল নাগরদোলা বসানো হয়েছে। জায়গাটা ঘিরে অগুনতি মানুষের জটলা। একসময় দিবাকররা সেখানে চলে এলেন। শুভেন্দু আর মণিময় খুশিতে বাচ্চাদের মতো নেচে উঠলেন। তাঁরা কখনও নাগরদোলায় চড়েননি। আজ যখন হাতের কাছে সেটা পেয়ে গেছেন তখন আর ছাড়াছাড়ি নেই।

দিবাকর ওঁদের আটকে দিলেন। কেননা তাঁদের সবারই কেমো চলছে। নাগরদোলায় বাঁই বাঁই করে পাক খেলে মারাত্মক বিপত্তি ঘটে যাবে। আজকের দিনটা এখনও শেষ হয় নি, তারপরও চারটে দিন রয়েছে। আজই কিছু অঘটন ঘটলে লাইফলাইন হাসপাতালে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শনের জন্যই তাঁরা যে বেরিয়ে পড়েছেন তা আর এ জন্মে হয়ে উঠবে না।

ভিড় যত জমেছে, নাগরদোলায় তত লোক উঠছে না। দিবাকর খোঁজ নিয়ে জানলেন, কয়েক চক্কর ঘোরায় জন্য মাথাপিছু পাঁচটি করে টাকা গুনে দিতে হবে। কিন্তু এত লোকের সাধ মিটবে না, তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে, তা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। নাগরদোলার মালিকের সঙ্গে দরদস্তুর করে ঠিক করা হল, এখানে যত লোক জড়ো হয়েছে—কাচ্চা বাচ্চা, বুড়োধুড়ো, যুবকযুবতী—সবাইকে চড়িয়ে দিতে হবে। সেজন্য একসঙ্গে সে থোক চারশো টাকা পাবে। লোকটা রাজি হয়ে যায়। তবে দিবাকরদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে হয়তো খানিকটা সন্দিহানও হয়ে

পড়ে। এমন ছিটগ্রস্ত, উড়নচণ্ডে লোক আগে আর কখনও দেখেনি সে। সারাদিন নাগরদোলার চাকা ঘুরিয়ে দু-আড়াই শো'র বেশি রোজগার হয় না। কিন্তু এখানে যত লোক জমেছে, তাদের নাগরদোলায় পাক খাওয়াতে দু'ঘন্টার বেশি লাগার কথা নয়। আর সেজন্য কিনা নগদ চারশো টাকা! আজ সকালে কার মুখ দেখে যে সে উঠেছিল!

দিবাকর টাকা বার করতে যাচ্ছিল, শুভেন্দু তাঁকে থামিয়ে দিল।—'সকাল থেকে আপনি খরচ করে যাচ্ছেন। বাইরের পৃথিবীর আনন্দ আর এক্সপিরিয়েন্স আমরা সবাই একসঙ্গে শেয়ার করব। খরচটাও শেয়ার করতে দিন।'

দিবাকর হাসলেন।—'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

শুভেন্দু মানি-ব্যাগ থেকে টাকা বার নাগরদোলার মালিককে দিল। লোকটা মাথা ঝুঁকিয়ে পর পর বিশ পঁচিশটা সেলাম ঠুকল। জীবনে এত খুশি বুঝিবা আগে আর কখনও হয়নি।

দিবাকর ভুবনের দিকে ফিরলেন। সে হাঁ করে তিনজন উদ্ভট মানুষের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। দিবাকর তাকে বললেন, 'নাগরদোলা তো হল, গাইডবাবু, বিকেলে চা খাওয়া হয়নি। আমাদের কোনও চায়ের দোকানে নিয়ে চল।'

'আসেন স্যারেরা—'

কাছাকাছি তেরপলের ছাউনির তলায় একটা চায়ের দোকান। সামনের দিকে খদ্দেরদের বসার জন্য ক'টা বেঞ্চি আর প্ল্যাস্টিকের টুল। সেখানে বসে প্ল্যাস্টিকের গেলাসে ক'টা গেঁয়ো লোক চা খাচ্ছিল। ভুবন তাড়া দিয়ে তাদের তিনজনকে তুলে দিতে দিতে বলল, 'ওঠ ওঠ, সায়েবদের বসতি দাও—'

দিবাকরদের চেহারা, পোশাক আশাক দেখে দোকানদার হকচকিয়ে গিয়েছিল। এ জাতীয় খদ্দের তার দোকানে কখনও আসে না। দারুণ উত্তেজিত সে।—'বসেন বাবুরা, বসেন—'

মণিময় খুঁতখুঁত করছিলেন। এমন একটা নোংরা, বিদঘুটে দোকানে টুলে বসে চা খাবার কথা কস্মিনকালেও ভাবেননি। নিচু গলায় বললেন, 'দিবাকরদা, টি-শপটা বড্ড নোংরা—'

দিবাকর বললেন, 'গ্রামের মেলায় ঝকঝকে এয়ার-কন্ডিশনড রেস্তোরাঁ পাচ্ছ কোথায়? গরম চায়ে ব্যাকটেরিয়া থাকবে না।' বলতে বলতে তাঁর নজরে পড়ল, পর পর বেশ ক'টা তেলেভাজার দোকান। বড় বড় কড়াইতে ফুটন্ত তেলে বেগুনি, আলুর চপ, ফুলুরি টুলুরি ভাজা হচ্ছে।

এদিকে ভুবন ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দোকানিকে বলতে লাগল, 'গেলাস ভাল কইরে ধুয়ে স্যারেদের ইস্পিশাল চা কইরে দাও। দুধ বেশি, চিনি কম।'

একটু পর চা খেতে খেতে তেলেভাজায় দোকানগুলের দিকে ফের দিবাকরের চোখ চলে গেল। কয়েক লহমা তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর জোরে শ্বাস টেনে বললেন, 'আ, গ্র্যান্ড গন্ধ বেরুচ্ছে। কতকাল যে ফুলুরি টুলুরি খাই না। গাইড, চট করে আমাদের জন্যে বেগুনি ফুলুরি নিয়ে এস তো—'

টাকা নিয়ে ঝড়ের গতিতে চলে গেল ভুবন।

শুভেন্দু আর মণিময়ের চোখ গোলাকার হয়ে গেছে।—'এই সব বাজে তেলে ভাজা জিনিস খাবেন?'

দিবাকর হেসে হেসে বলেন, 'অনিয়ম করার জন্যেই তো বেরিয়েছি। একটু না হয় কুপথ্য করলাম।' তারপর ভরসা দিলেন, 'গরম চায়ের মতো গরম গরম তেলেভাজাতেও ব্যাকটেরিয়া বেঁচে থাকতে পারে না। ভয় নেই—'

মেলার চারিদিক থেকে লক্ষ কোটি মাছির ভনভনানির মতো আওয়াজ উঠে আসছিল। অগুনতি মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর। হঠাৎ সে-সব ছাপিয়ে অনেকের উত্তেজিত চিৎকার ভেসে আসে। একসঙ্গে চেঁচানোর জন্য বোঝা যাচ্ছে না লোকগুলো কী বলছে।

হঠাৎ চোখে পড়ল একটি বাইশ তেইশ বছরের যুবতী, পরনে লাল সিল্ক, খোঁপায় ফুলের সাজ ভিড়ের ভেতর দিয়ে উদভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে মেলার উত্তর দিকটায় মিলিয়ে গেল। একটু পরেই একটা হিংস্র ঘাতকের দল, হাতে তাদের আদিম মারণাস্ত্র—লাঠি, বল্লম, দা, মেয়েটা যেদিকে গেছে সেদিকে দৌড়ে গেল।

চকিত হয়ে উঠেছিলেন দিবাকর। চায়ের দোকানদারকে জিগ্যেস করলেন, মেয়েটাকে ওরা তাড়া করছে কেন?

ভুবন ঠোঙা বোঝাই তেলেভাজা নিয়ে ফিরে এসেছিল। মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে জবাবটা সে-ই দিল।—'বজ্জাত মেইয়েমানুষই হবে। ওর বাড়ির লোক ওরে টিট করতি চায়। এ নিয়ে মাতা ঘামাবেন না স্যার। এই ল্যান বেগুনি, ফুলুরি।'

ভুবন বলল বটে, তবু মেয়েটার জন্য বুকের ভেতরটা কেমন যেন খচখচ করতে লাগল দিবাকরের। যত সহজ ব্যাখ্যা ভুবন দিয়েছে, ব্যাপারটা বোধহয় ততখানি সহজ নয়।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করতেই বিকেল প্রায় ফুরিয়ে এল। মেলার প্রায় সব দোকানেই আলো জ্বলে উঠছে একে একে। হুকিং করা বিজলি বাতি।

দিবাকর বললেন, 'মেলা তো মোটামুটি দেখা হল। এবার ফেরা যাক।' বলতে বলতে দেখতে পেলেন, বাঁদিকে, বেশ খানিকটা দূরে, একটা মস্ত তেরপল খাটানো হয়েছে। সেখানে জোরালো আলো জ্বলছে। লোকজনও রয়েছে প্রচুর।

কিছুক্ষণ লক্ষ করার পর দিবাকর জিগ্যেস করলেন, 'ও হে ভুবনচন্দ্র, ওখানে কী হচ্ছে?'

ভুবন বলল, 'সন্ঝের (সন্ধের) সোমায় যাত্রা হবে। 'সীতাহরণ'। সারারাত চলবে। ইদিককার (এধারে) সব চাইতে বড় দল। পশুপতি মান্নার 'মহামায়া অপেরা'। ওদের পালা শুইনলে পেরান তর হইয়ে যায়।'

কলকাতার যাত্রাদলগুলো আজকাল যেসব পালা নামায় সেগুলো না যাত্রা, না থিয়েটার, না সিনেমা। সব একাকার হয়ে জবড়জং খিচুড়ি। আগে পালা হত রাতভর। ইদানীং বড়জোর তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা। আর্মিতে থাকার সময় শেষ দিকে কলকাতায় এলে দু-একটা দেখেছেন, কিন্তু ভালো লাগেনি।

দিবাকর দারুণ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। 'গ্রামের যাত্রাগুলো হল আসল যাত্রা। হানড্রেড পারসেন্ট খাঁটি। এরা বেঙ্গলের ট্রাডিশন ধরে রেখেছে। আগে কখনও দেখিনি। আজকের রাতটা 'সীতাহরণ' দেখেই কাটানো যাক—তোমরা কী বলো?' তিনি মণিময়দের দিকে তাকালেন।

মণিময় আর শুভেন্দু শহুরে বা গ্রামীণ, কোনও যাত্রাই দেখেননি। দু'জনেই ভীষণ উত্তেজিত। বলল, 'নিশ্চয়ই দেখব। খোলা মাঠে 'সীতাহরণ'! দারুণ একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে।'

দিবাকর ভুবনকে বললেন, 'এখানে হাতে-গড়া রুটি আর তরকারি পাওয়া যাবে?'

ভুবন ঘাড় কাত করে। 'কত চাই?'

'যাত্রার আসরে যাওয়া যাক। রাত একটু বেশি হলে তুমি গিয়ে কিনে নিয়ে এসো। খেতে খেতে পালা দর্শন এবং শ্রবণ দুইই হবে। এই নাও, দামটা রাখো—' পকেট থেকে টাকা বার করে ভুবনকে দিলেন দিবাকর।

তেরপলের ছাউনির তলায় মস্ত আসর। এখানেই পালা দেখানোর ব্যবস্থা। তিন দিক একেবারে খোলা। বাকি দিকটায়, একটু দূরে নীল রঙের কাপড় দিয়ে খানিকটা জায়গা ঘেরা। সেটা 'মহামায়া অপেরা'র সাজঘর। যে তিনটে দিক খোলা সেখানে চট বিছিয়ে দর্শকদের বসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ক'টা কাঠের চেয়ারও আছে। সেগুলো আজেবাজে রামাশ্যামাদের জন্য নয়, উঁচুদরের লোকেরা তাতে বসবে। তেরপলের ছাদ ফুটো করে অনেকগুলো ইলেকট্রিকের লম্বা তার নেমে এসেছে। প্রতিটি তারের তলায় একটা করে বাল্ব আটকানো। তেজি আলোর বান ডেকেছে আসর জুড়ে। এখানেও হুকিংয়ের কেরামতি।

ভুবন দিবাকরদের যাত্রার আসরে নিয়ে এল। আসর অবশ্য এখন একেবারে ফাঁকা। তবে দর্শক জমতে শুরু করেছে। দিবাকরদের চেয়ারে বসিয়ে ভুবন বলল, 'আমি এট্টু আসতিচি স্যারেরা।'

দিবাকর লক্ষ করেছেন, মেলার প্রায় সবাইকে চেনে ভুবন, সবার সঙ্গে খাতির। এবং সে সর্বত্রগামী। একখানা আস্ত পা এবং একটা সরু ছোট পা, এই দেড় পায়ে বেঁকে চুরে তরতর করে সে সাজঘরে চলে গেল।

কাপড়ের ঘেরের ওধারেও আলো জ্বলছিল। আবছাভাবে ওখানে যাত্রাদলের লোকজনদের দেখা যাচ্ছে। তাদের টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই পালায় নামার আগে এখন সাজগোজ চলছে।

মিনিট পাঁচেকের ভেতর একটা মাঝবয়সী লোককে সঙ্গে করে নিয়ে এল ভুবন। ভারী ধরনের চেহারা। মাজা মাজা রং। গোলাকার মাংসল মুখ।

কাঁচাপাকা চুলের মাঝখান দিয়ে সিঁথি। ঢেউখেলানো চুল দু'ধারে দুই কানের ওপর লতিয়ে নেমে এসেছে। বড় বড় ড্যাবডেবে চোখ দু'টো লালচে এবং ঢুলুঢুলু। বোঝাই যাচ্ছে এই সন্ধেবেলায় দিশি মাল চড়িয়েছে। পুরু কালো ঠোঁট। খুব সম্ভব জন্মের পর থেকে বিড়ি ফুঁকে ফুঁকে ওই হাল।

লোকটার পরনে ধুতি, লম্বা ঝুলের গরম কাপড়ের পাঞ্জাবি আর উড়ুনি। কপালে গোলা সিঁদুরের মস্ত ফোঁটা। দুই হাতে কম করে নানা পাথর-বসানো আংটি। হীরে পান্না গোমেদ ইত্যাদি। পায়ে কাবলি স্যান্ডেল।

ভুবন পরিচয় করিয়ে দিল।—'ইনিই হলেন গে পশুবাবু, 'মহামায়া অপেরা'র অধিকারী।' দিবাকরদের দেখিয়ে পশুপতিকে বলল, 'এনাদের কথা আপনাকে আগেই বলেচি।'

পশুপতি হাতজোড় করেই ছিল। বিনয়ে পিঠ ঝুঁকিয়ে বিগলিত সুরে বলল, 'বাবুমশাইরা আমাদের গেঁয়ো যাত্রা দেকতে এয়েচেন। আমরা ধন্যি হইয়ে গেচি।'

ভুবন যে রীতিমতো ফলাও করে তাঁদের মহিমাকীর্তন করেছে, পশুপতির কথাবার্তায় এবং আচরণে তা টের পাওয়া যাচ্ছিল। দিবাকর বললেন, 'শহরের যাত্রায় অনেক ভেজাল ঢুকে গেছে। গ্রামের যাত্রায় সেসব ঢোকে নি বলেই শুনেছি। মেলায় যখন এসেই পড়েছি, ভাবলাম আপনাদের 'সীতাহরণ'টা দেখেই যাই।'

'আমাদের ভাগ্যি। পালা শেষ হতি হতি ভোর হইয়ে যাবে। তকনও যদিন থাকেন, দয়া করে বলে যাবেন, ক্যামন লাগল।'

'শেষ পর্যন্ত থাকব। আপনার সঙ্গে দেখাও করে যাব। পালা শুরু হবে। এখন আপনারা ভীষণ ব্যস্ত। আপনাকে আর আটকে রাখব না।'

পশুপতি মান্না সাজঘরে ফিরে গেল।

আরও ঘণ্টাখানেক বাদে গোড়াতেই যা আরম্ভ হল তাতে চমকে গেলেন দিবাকররা। মঞ্চে এসে ঢুকল চার পাঁচটি যুবক। তাদের পরনে চোঙা ধরনের প্যান্ট, শার্ট আর সস্তা জ্যাকেট। হাতে ব্যাঞ্জো, গিটার টিটার জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। এক লহমাও তারা নষ্ট করল না। চড়া সুরে বাজাতে শুরু করল। 'সীতাহরণ'-এর সঙ্গে এই বাজনার কী সম্পর্ক বোঝা যাচ্ছে না। চরম বিভ্রান্তি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন দিবাকররা।

উত্তুরে বাতাসে ঝাঁ ঝাঁ করা আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। দিবাকররা যখন আসেন অল্প কিছু লোক চটের আসনে বসে ছিল। তারপর ধীরে ধীরে আরও অনেকে আসতে থাকে। বাজনার সুর কানে যেতে মেলা ফাঁকা করে মানুষজন ঝাঁকে ঝাঁকে দৌড়ে এল। মুহূর্তে মঞ্চের তিন দিকের চট বোঝাই হয়ে গেল। যারা বসার জায়গা পায়নি, পেছন দিকে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুর ক্রমশ চড়ছে, চড়তে চড়তে যখন অনেক উঁচু পর্দায় গিয়ে উঠল সেই সময় সাজঘর থেকে একটি বাইশ তেইশ বছরের যুবতী নাচের ভঙ্গিতে ছুটতে ছুটতে মঞ্চে চলে এল। পরনে বিকিনি ধরনের লাল টকটকে জাঙিয়া, লাল রঙেরই কাঁচুলি দিয়ে বিশাল, পুষ্ট বুক বাঁধা। অর্থাৎ পোশাক প্রায় নেই বললেই হয়। তার ওপর গলা থেকে পা অব্দি মলমলের স্বচ্ছ আবরণ, সেটার সামনের দিকটা খোলা, শুধু কোমরের কাছে একটা বোতাম আটকানো। মেয়েটার মুখে চড়া মেক-আপ, ঠোঁট দু'টো রক্তবর্ণ। চোখে কাজলের লম্বা টান।

সারা মঞ্চ জুড়ে প্রবল ঘূর্ণি তুলে কোমরে ক্ষিপ্র মোচড় দিতে দিতে নেচে চলেছে মেয়েটা। হাওয়ায় মলমলের ঢাকনি সরে সরে গিয়ে উরু, জানু, পায়ের গোছ, পেট, বুক বেরিয়ে পড়ছে। এলো চুল সামনে উড়ছে।

নাচের সঙ্গে সঙ্গে গেয়েও চলেছে মেয়েটা :

পেরান জুড়ে জ্বইলচে আগুন
শরীল জুড়ে জ্বইলচে আগুন
দাউ দাউ বেড়া আগুন হে
এ আগুন যায় না দেকা
দিবারাত্তির দিচ্চে ছ্যাঁকা
কে আচ অ্যামন বাপের বেটা
কার আচে অ্যামন বুকের পাটা
পার কি জুড়োতে এই তপ্ত শরীল
জ্বইলচে বড় আগুন হে
কাচে এইসে বুকে তুইলে নাও
জ্বইলচে বড় আগুন হে...

মেয়েটার গানের গলা বেশ সুরেলা আর তেজি। সেই সঙ্গে মেশানো রয়েছে একটা খসখসে ভাব যা কিনা মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজনায় টান টান করে তোলে। তার গানে এবং নাচে সারা আসর জুড়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছিল।

দর্শকদের চোখের পাতা পড়ছিল না। শ্বাসরুদ্ধের মতো তারা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে। চারিদিক থেকে সিটি মারার শব্দ উঠে আসছে। সেই সঙ্গে উদ্দাম হইচই।

'ঘুইরে ফিরে নাচ রে চাঁদবদনী—'

'শালী আমারে মেইরে ফ্যাল, মেইরে ফ্যাল—'

'যা গাইচে আর নাচচে যেন বুকের মদ্যি চাক্কু ঢুইকে যাচ্চে।'

নাচ গান একসময় শেষ হয়। যুবতী আর বাজনদারেরা ফের সাজঘরে চলে যায়।

তারপরেই আর-একদল বাজনদার এসে মঞ্চের একধারে লাইন দিয়ে বসে গেল। এরা প্রায় সবাই মাঝবয়সী। পরনে শার্ট কি পাঞ্জাবির ওপর চাদর। বেশির ভাগেরই বাবরি। কেউ এনেছে হারমোনিয়াম, কেউ ডুগিতবলা, কেউ আড় বাঁশি, কেউ করতাল ইত্যাদি। এরাই হচ্ছে যাত্রার আসল বাজনদার।

অনেকক্ষণ ধরে কনসার্ট চলল। তারপর শুরু হল পালা। রামায়ণের সেই চিরকালীন কাহিনি। কুঁজি মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ী কীভাবে রামকে বনবাসে পাঠাল, তাঁর সঙ্গে গেলেন সীতা এবং লক্ষ্মণ। পথে নানা ঘটনার পর ওঁরা এলেন দণ্ডকারণ্যে।

পালার নানা দৃশ্যে এসব দেখানো হচ্ছিল। তার ফাঁকে ফাঁকে সেই যুবতী আর আগের বাজনাদররা এসে নেচে গেয়ে এবং বাজিয়ে আসর গরম করে করে যাচ্ছিল।

'মহামায়া অপেরা'র শিল্পীদের অভিনয় মোটা দাগের হলেও মোটামুটি ভালই। যাত্রা পালায় এমনটাই দেখা যায়। কয়েক জনের গানের গলাও চমৎকার।

আবহমান কালের চেনা চরিত্র এবং ঘটনা। পালার গাঁথুনি বেশ ভাল। গান আর অভিনয়ের গুণে 'সীতাহরণ' দারুণ জমে উঠল। তার মধ্যেই ভুবন

রুটি তরকারি কিনে এনেছিল। খেতে খেতেই দিবাকররা দেখতে লাগলেন। সঙ্গে জলের বোতল ছিল। খাওয়া শেষ হলে জল খেয়ে নিলেন।

তবে পালা জমলেও ওই মেয়েটার নোংরা নাচ, গান এবং ছোকরাগুলোর বাজনা মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছিল দিবাকরদের। পশুপতি মান্নার মাথায় কি ভূত চেপেছে যে এরকম একটা কুৎসিত ব্যাপার 'সীতাহরণ' পালায় গুঁজে গুঁজে দিচ্ছিল! চিরন্তন মহাকাব্যের মান ইজ্জৎ এভাবে কেউ নষ্ট করে!

পালা যখন শেষ হল, সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই। সূর্য ওঠে নি ঠিকই, তবে পুব দিকটা আলোয় ভরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

রোগ ধরা পড়ার পর রাত জাগা বারণ দিবাকরদের। আজ মারাত্মক অনিয়ম হয়ে গেল। চোখ জ্বালা জ্বালা করছে। কপালের দু'পাশের রগ দপ দপ করছে। সমানে। তবে শরীরে আর কোনও অস্বস্তি হচ্ছে না। এটুকুই যা বাঁচোয়া। দিবাকর বললেন, 'পশুপতি মান্নার সঙ্গে একবার দেখা করে চল যাওয়া যাক। লোকটা যথেষ্ট খাতির করেছে।'

সাজঘরে যেতে হল না। অধিকারী পশুপতি মান্না হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হল। রাতের পর রাত জাগার অভ্যাস যাত্রাদলের লোকেদের। বিনা ঘুমে কাটিয়ে দিলেও শরীর এতটুকু টসকায় না। সন্ধেবেলায় পশুপতির চেহারায় যে তাজা ভাবটা ছিল রাত কাবার হবার পরও সেটা ঠিক তেমনিই আছে।

হাতজোড় করে পশুপতি জিগ্যেস করে, 'আজ্ঞা, আমাদের পালা ক্যামন লাগল?'

'ভাল, বেশ ভাল। রাম, সীতা আর রাবণ চমৎকার করেছে।' বলেই কষে ধমক লাগালেন, 'পালার মাঝে মাঝে ওই ছুকরিটাকে দিয়ে অমন কুৎসিত নাচ নাচাচ্ছিলেন কেন? ওর গানটাও কী জঘন্য! হিন্দি ছবিতে এসব দেখা যায়। তাদের নকল করছেন কেন?'

কাঁচুমাচু মুখে পশুপতি বলল, 'ওই হিন্দি বইগুলোই তো আমাদের কাল হয়ে দোঁড়িয়েচে। আমাদের মরণ। ওই নাচটা যদিন মদ্যিখানে মদ্যিখানে না ঢুকোই কেউ পালা দেকবে? সব্বাই হিন্দি বইয়ের ভিডিও দেকতে দৌড়বে।

পেটের দায়ে এসব করতে হচ্চে। লইলে দল তুইলে দিতি হবে বাবুমশাইরা—'

দিবাকর স্তম্ভিত। যে যাত্রাদলগুলো ভারতবর্ষের সেরা এপিকদের নিয়ে পালা বাঁধে তাদের টিকে থাকার জন্য কী মরণপণ যুদ্ধই না করতে হচ্ছে! রামায়ণের প্রতিদ্বন্দ্বী কিনা তৃতীয় শ্রেণির রদ্দি হিন্দি ছবি!

পশুপতিদের জন্য খুবই সহানুভূতি হচ্ছিল দিবাকরের। এবার নরম গলায় বললেন, 'আপনাদের জন্যে দুঃখ হয়। তবে আমার অনুরোধ রামায়ণ মহাভারত ছাড়া আর কোনও বিষয় নিয়ে পালা নামাবেন না। এই দুই মহাকাব্যই হল আমাদের দেশের সব চাইতে খাঁটি জিনিস। এপিক দু'টোর জন্যে বিদেশে আমাদের কত সম্মান।'

দিবাকরের আবেগ-ভরা এই সব ভারি ভারি কথা পশুপতির মর্মমূলে কতখানি প্রবেশ করল সে-ই জানে। হেঁ হেঁ করে বলল, 'বড্ড সত্যি কথা বলেচেন বাবুমশাই, একেবারে আসল কথা। এটি মাতায় কইরে নিলাম।'

দিবাকর পাঁচ শো টাকার একখানা নোট বার করে পশুপতিকে দিতে দিতে বললেন, 'আপনাদের পালা দেখে খুশি হয়েছি। এই টাকা দিয়ে সবাই মিলে মিষ্টি খাবেন।'

বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থাকে পশুপতি। গেঁয়ো যাত্রাদলের পালা দেখে কেউ যে নগদ পাঁচশো টাকা ইনাম দিতে পারে, এ তার পক্ষে অভাবনীয়। মনে হল স্বপ্ন দেখছে।

'চলি—'

মণিময়দের সঙ্গে করে দিবাকর পা বাড়াতে যাবেন, পশুপতির হঠাৎ যেন চমক ভাঙে। হাতজোড় করেই ছিল। অনুনয়ের সুরে বলে, 'ভোবনকে দে খপর দেব, ফের য্যাকন পালা লামাব আপনাদের আসতিই হবে।'

দিবাকর হাসলেন, 'আর বোধহয় আপনাদের পালা দেখা হবে না। সময় বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে আসছে।'

তাঁর কথায় যে প্রহেলিকা রয়েছে, পশুপতির তা বোঝার কথা নয়। তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কী-ই বা সে করতে পারে?

ছয়

যাত্রার আসর থেকে বেরিয়ে চারজন, দূরে মেলার একপাশে যেখানে গাড়িটা রাখা আছে, সেদিকে হাঁটতে লাগলেন। আজও মেলা চলবে। তাই যারা দোকানপাট সাজিয়ে বসেছিল তারা কেউ চলে যায়নি। তেরপলের ছাউনির নিচে কম্বল মুড়ি দিয়ে হেমন্তের হিমে কুঁকড়ি মুকড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দু'চারজন অবশ্য উঠে পড়েছে। চাদর জড়িয়ে বসে বসে হাই তুলছে। আজ মেলা শেষ হলে মালপত্র গুটিয়ে নিয়ে ফিরে যাবে।

গাড়ি থেকে ব্রাশ পেস্ট তোয়ালে বার করে মন্দির চত্বরে চলে গেলেন দিবাকররা। টিউবওয়েলে মুখ টুখ ধুয়ে চোখে প্রচুর ঠান্ডা জল ছিটোতে রাত জাগার কারণে চোখের যে জ্বালা জ্বালা ভাবটা ছিল তার অনেকটাই কেটে গেল। জলে আশ্চর্য কোনও ম্যাজিক থাকে । এখন বেশ আরাম লাগছে তাঁদের।

এত সকালে অন্য দোকানিদের গরজ না থাকলেও তিন চারটে চায়ের দোকান কিন্তু এর মধ্যেই খুলে গেছে। দিবাকররা একটা দোকানে এসে প্ল্যাস্টিকের গেলাসে পর পর দু'কাপ করে চা খেলেন। ঠান্ডা জলের পর গরম চা। শারীরিক আরামটা আরও একটু বেড়ে গেল।

চা খাওয়া শেষ হলে দিবাকর ভুবনকে বললেন, 'তোমাকে আমাদের খুব ভাল লেগেছে। তোমার জন্যে মেলাটা খুব ভাল করে দেখতে পেলাম। এবার আমরা চলে যাব। বলেছিলাম একশো টাকা দেব। ভেবে দেখলাম তুমি যা খেটেছ, সেটা খুব কম। এই নাও।' পকেট থেকে এক গোছা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে ভুবনকে দিলেন।—'গোনো গোনো, গুনে নাও—'

গোনা যখন শেষ হল, বিস্ময়ে উত্তেজনায় ভুবনের চোখ গোল হয়ে গেছে।

দিবাকর ভুরু অল্প অল্প নাচিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কি হে মিস্টার গাইড, কত আছে?'

ভুবন বলল, 'চার শো স্যার—'

'খুশি তো?'

ঘাড় কাঁধ অব্দি হেলিয়ে দিল ভুবন। —'খুব খুশি। জেবনে এক সন্‌গে এত টাকা কক্ষনো রোজগার করিনি।'

'ঠিক আছে। আমরা এখন চলি।'

'আসচে বচ্ছর আবার আসবেন। আপনাদের জন্যি পথ চেয়ে থাকব।'

দিবাকর হাসলেন। ভুবনের কাঁধে একখানা হাত রেখে বললেন, 'পশুপতি মান্নাকে কী বললাম শোন নি? আমাদের হাতে সময় বড় কম। আর মোটে ছ'টা মাস। এক বছর পর আসব কী করে?'

দিবাকররা আর দাঁড়ালেন না। ভুবনকে জটিল এক ধন্দের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

***

গাড়িতে প্রচুর জ্যাম জেলি চিজ ফল টল আর পাউরুটি রয়েছে। ব্রেকফাস্ট সেরে ফের তাঁদের দৌড় শুরু হল। এবার স্টিয়ারিং হাতে বসেছে শুভেন্দু।

মেলার পাশের রাস্তা থেকে পাঁচ মিনিটের ভেতর নীল অ্যামবাসাডর হাইওয়েতে এসে পড়ল। রোদ উঠতে শুরু করেছে। হেমন্তের ঝলমলে রোদ। কেউ যেন স্বর্ণকলস উপুড় করে গলানো সোনা উপুড় করে দিচ্ছে।

এদিকেও দু'ধারে অবাধ ধানের খেত। সেই খালটা সঙ্গ ছাড়ে নি। নাছোড়বান্দা হয়ে পাশে পাশে চলেছে। পাখি উড়ছে আকাশ জুড়ে। রাত পোহাতে না পোহাতে খাবারের সন্ধানে তারা বেরিয়ে পড়েছে।

হাইওয়ে, তাই গাড়ি চলছে অবিরল। স্রোতের মতো। দিবাকরদের নীল অ্যামবাসাডর মসৃণ রাস্তায় সাঁই সাঁই ছুটছে।

মণিময় বলছিলেন, 'দিবাকরদা, আপনার কথামতো ভাগ্যিস বেরিয়ে পড়েছিলাম। তাই কত রকমের মানুষ দেখা হল, কত ধরনের এক্সপিরিয়েন্স হল। কালকের দিনটা চমৎকার কেটে গেল।'

দিবাকর অন্যমনস্ক ছিলেন। মণিময়ের কথা কানে যেতে তাঁর দিকে ফিরে তাকান। 'আমি একটা ব্যাপার ভাবছিলাম।'

মণিময় উৎসুক হলেন।—'কী?'

'কাল আমরা সারাটা দিন কত যে অনিয়ম করেছি! বাজে তেলে ভাজা ফুলুরি বেগুনি খেয়েছি। ভোগের খিচুড়ি খেয়েছি। সস্তা দোকানের রুটি তরকারি খেয়েছি। পুরো মেলা চক্কর দিয়ে বেড়িয়েছি। রাত জেগে যাত্রা দেখেছি। যা যা আমাদের পক্ষে ফরবিডন তার কিছুই বাদ দিই নি। অনিয়মের এই লম্বা লিস্টটা যদি ডাক্তার স্মিথ আর ডাক্তার অ্যান্টনি জানতে পারেন, ওঁদের স্ট্রোক হয়ে যাবে। এত যে কাণ্ড করেছি, তা সত্ত্বেও—'

কাল যা যা করা হয়েছে সবই তো জানা। তবু নতুন করে দিবাকরের এই ফিরিস্তি দেবার কারণ কী? মণিময়ের ঔৎসুক্য বেড়ে যায়। জিগ্যেস করেন, 'তা সত্ত্বেও কী?'

দিবাকর বললেন, 'আমার পেটে তো যন্ত্রণা হবার কথা। কিন্তু কিছুই হয়নি। কোয়াইট নর্মাল—' একটু থেমে জিগ্যেস করলেন, 'তোমরা কি কোনও কষ্ট কষ্ট ফিল করছ?'

এই দিকটা আগে খেয়াল করেননি মণিময়। রীতিমতো অবাক হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, 'আশ্চর্য, আমার লাংয়েও এতটুকু পেইন হয়নি, এখনও হচ্ছে না।'

স্টিয়ারিং হাতে উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে তাকিয়ে ছিল শুভেন্দু। তার পক্ষে মণিময়দের দিকে তাকানো সম্ভব নয়। অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। সোজা রাস্তার দিকে চোখ রেখেই বলল, 'আমারও কোনও ট্রাবল নেই। এভরিথিং ইজ পারফেক্টলি অলরাইট।'

দিবাকর লঘু সুরে বললেন, 'সবই বোধহয় ঠাকুরবাবার কৃপা। জয় জয় ঠাকুরবাবা—'

মণিময় হেসে হেসে বললেন, 'মিরাকল কিছু ঘটে গেল নাকি?'

হালকা চালে কথা বলতে বলতে ওঁরা একটা লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে এসে থেমে গেলেন। দু'জোড়া রেললাইন হাইওয়েটাকে চিরে দু'দিকে চলে

গেছে। লাইনের দু'ধারের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার মানে কোনও এক দিক থেকে ট্রেন আসছে।

এদিকে রেললাইনের দু'ধারে লাইন দিয়ে ট্রাক, বাস, প্রাইভেট কার, ট্রেকার ইত্যাদি দাঁড়িয়ে পড়েছে। যতক্ষণ না ট্রেন পাস করে চলে যাচ্ছে, দু'পাশের গাড়িগুলোর নড়াচড়া বন্ধ।

কখন ট্রেন আসবে, সেই আশায় বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। অগুনতি গাড়ির ফাঁদে আটকে গেছেন দিবাকররা। হঠাৎ তাঁদের চোখে পড়ল হাইওয়ে থেকে একটু নিচে একটা বড় লাক্সারি বাস দাঁড়িয়ে আছে। বাসটা যাত্রীতে ঠাসা। কিশোর কিশোরী, তরুণতরুণী, মধ্যবয়সী—নানা বয়সের মানুষ। ক'টি ছোট ছেলেমেয়েও রয়েছে এদের মধ্যে। দামি পোশাক আশাক, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা দেখে মনে হয় বেশ সচ্ছল সুখী পরিবারের মানুষজন। এদের আর্থিক দিক থেকে যে দুর্ভাবনা নেই, সেটা দেখামাত্র টের পাওয়া যায়।

দিবাকর লক্ষ করলেন, বাসে কম করে তিরিশ থেকে চল্লিশ জন রয়েছে। একই পরিবারের এত মানুষ? এখনও বিশাল জয়েন্ট ফ্যামিলি কি টিকে আছে? পরক্ষণেই তাঁর নজরে পড়ল বাসের ছাদ চারিদিকে উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা। সেখানে প্রচুর জিনিসপত্র। বিরাট বিরাট হাঁড়ি, কড়া, ডেকচি, গ্যাস সিলিন্ডার, ভারি ভারি অনেকগুলো বস্তা, এমনি অনেক কিছু।

ব্যাপারটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায়। না, একান্নবর্তী পরিবার নয়। বেশ ক'টি ফ্যামিলি মিলে পিকনিক টিকনিক করতে চলেছে।

বাসের ভেতর বাচ্চাগুলো সমানে কলরবলর করে চলেছে। বয়সে যারা বড় তারাও চুপ করে নেই সমানে কথা বলছে। মাঝে মাঝে কোনও মজার প্রসঙ্গে হাসির ধুম পড়ে যাচ্ছে।

এবার নজরে পড়ল, লাক্সারি বাসের বনেট খুলে ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দু'টো লোক খুটুর খাটুর করে কী যেন করছে। খুব সম্ভব বাসটার ড্রাইভার এবং তার হেল্পার। কয়েকজন বেশ সুপুরুষ প্রৌঢ় এবং পাঁচ সাতটি যুবক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেখছে। এদের চোখেমুখে কিঞ্চিৎ উদ্বেগ।

মণিময় এবং শুভেন্দুও ওদের লক্ষ করেছিলেন। মণিময় বললেন, 'মনে

হয় বাসটার ইঞ্জিন টিঞ্জিনে কোনও প্রবলেম দেখা দিয়েছে। তাই গাড়িটা রাস্তা থেকে নিচে নামিয়ে খুব সম্ভব সারাবার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

কথাগুলো দিবাকরের কানে গিয়েছিল। বাসটার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বললেন, 'এগ্‌জাক্টলি। চল তো দেখি, ওদের হেল্প টেল্প করা যায় কি না। শুভেন্দু, গাড়িটা হাইওয়ের নিচে ঘাসের জমিটায় নামিয়ে 'লক' কর।'

দিবাকর ভীষণ ব্যস্তবাগীশ মানুষ। আনন্দ ভ্রমণে বেরিয়ে হঠাৎ কাজের গন্ধ পেয়ে গেছেন। আর কি অ্যামবাসাডরে নিষ্কর্মা বসে থাকা যায়? আসলে খুব অল্প বয়স থেকে গাড়ির দিকে তাঁর দারুণ ঝোঁক। বাস ট্রাক মিনিবাস থেকে শুরু করে যে কোনও মডেলের গাড়ির নাড়িনক্ষত্র তাঁর জানা। কোথায় কোন পার্ট রয়েছে, সেগুলোর কী নাম, সব মুখস্থ। একজন নিপুণ মেকানিকও তিনি।

দিবাকরের কথামতো অ্যামবাসাডরটা রাস্তা থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। তিনজন নেমে বাসটার কাছে চলে এলেন। যে সব প্রৌঢ় এবং যুবকেরা বাসের সামনের দিকটায় উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে ছিল, দিবাকরদের দেখে তারা রীতিমতো অবাক। তারা কিছু বলার আগেই দিবাকর জিগ্যেস করলেন, 'গাড়িটা খুব ঝামেলা করছে, তাই না?'

প্রৌঢ়দের মধ্যে একজন, বেশ সুপুরুষ, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, বললেন, 'হ্যাঁ, মানে—'

তাঁকে আর কিছু বলতে দিলেন না দিবাকর।—'গাড়িতে বসে দেখলাম খটর খটর আওয়াজ করে দু'টো লোক কী যেন করছে। বুঝলাম প্রবলেম হয়েছে। তাই নেমে আসতে হল—' বলতে বলতে যারা বনেটের ভেতর মুণ্ডুসমেত কোমর অব্দি ঢুকিয়ে মেরামত করছিল সোজা তাদের কাছে চলে এলেন। বললেন, 'দু'জনে বডি বার করে আমাকে দেখতে দাও—'

গমগমে গলার আওয়াজে লোক দু'টো চকিতে নিজেদের বার করে এনে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। একজনের বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ। তামাটে রং। মজবুত চেহারা। চৌকো মুখ। পরনে ঢোলা ফুল প্যান্ট আর বুশ শার্টের ওপর হাফ-হাতা সোয়েটার। অন্য লোকটা ঢ্যাঙা, সিড়িঙ্গে মার্কা, ভাঙা গালে খাপচা খাপচা দাড়ি। পরনে চাপা পাজামা আর বেঢপ একটা সস্তা ছিটের

শার্ট। শীত ঠেকাবার জন্য গরম চাদর বা সোয়েটার টোয়েটার কিছু নেই। দু'জনেরই গলদঘর্ম, বিধ্বস্ত অবস্থা। তাদের হাতে বড় মাঝারি আর ছোট, তিন রকমের রেঞ্চ রয়েছে।

এক লহমা দু'জনকে দেখে নিলেন দিবাকর। তারপর শক্তপোক্ত লোকটাকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই বাসের ড্রাইভার?'

'হ্যাঁ, স্যার। আমার নাম হরেন মণ্ডল।'

এবার স্কয়াটে চেহারার লোকটার দিকে আঙুল বাড়ালেন দিবাকর।—'এ কে? তোমার অ্যাসিস্টান্ট?'

'হ্যাঁ স্যার। ও হল ভন্টে—ভন্টে জানা।'

এরা দু'জন কী হতে পারে আগেই আন্দাজ করেছিলেন দিবাকর। দেখা গেল, ঠিকঠাক মিলে গেছে। জিগ্যেস করলেন, 'তোমরা মেকানিকের কাজ জানো?'

'ত্যামন কিছু নয়, এই এট্টু আধটুন।'

'এতক্ষণ তো গাড়ির ভেতর মুণ্ডু ঢুকিয়ে রেখেছিলে। গোলমালটা ধরতে পেরেছ?'

'না স্যার।' ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে হবেন ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ে।

অচেনা তিনটি মানুষ, সবারই সমীহ করার মতো চেহারা, পরনে দামি পোশাক আশাক, হঠাৎ অযাচিত চলে এসেছেন। সেই সুপুরুষ প্রৌঢ়টি এবং তাঁর সঙ্গীরা তো বটেই, বাসের ভেতর যারা ছিল তারাও নেমে এসে অবাক বিস্ময়ে তাঁদের দেখতে থাকে।

হরেন আর ভন্টে বনেটের মুখ আটকে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সরিয়ে দিয়ে নিজের মাথা ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। দিবাকর খুটখুট করে মিনিট চার পাঁচেক কী সব নাড়া চাড়া করে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'বড় আর ছোট রেঞ্চটা দাও। চারটে বল্টুও দরকার।'

বাসে একটা বড় ব্যাগের ভেতর নানা যন্ত্রপাতি, ছোটখাটো অজস্র গাড়ির পার্টস, এমনি টুকিটাকি বহু জিনিস থাকে। চলতে চলতে রাস্তায় গাড়ি কোনও কারণে বিগড়ে গেলে এসব কাজে লাগে। হরেন দু'টো রেঞ্চ দিবাকরের হাতে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে বাস থেকে বল্টু নিয়ে এল।

দিবাকর রেঞ্চ দিয়ে অনেকগুলো পার্টস টাইট করলেন কয়েকটা আলগা করে দিলেন, পুরনো বল্টু পালটে নতুন বল্টু লাগালেন। তারপর বনেটের তলা থেকে মাথা বার করে হরেনকে বললেন, 'যাও হে, ইঞ্জিনটা চালিয়ে দেখ তো—'

হরেন ফের এক ছুটে বাসে ফিরে গেল। ইঞ্জিনে স্টার্ট দিতেই সেটা শব্দ করে জানান দিল আর কোনও গোলমাল নেই। গাড়ি এবার মসৃণভাবে দৌড়বে।

ইঞ্জিন বন্ধ করে লাফ দিয়ে নেমে এল হরেন। দারুণ উত্তেজিত সে। একখানা লম্বা স্যালুট ঠুকে বলল, 'স্যার, আপনার হাতে ভেলকি আচে। স্বয়ম বিশ্বকর্মা। সারা দিন মাথা ঠুকলেও আমি গাড়ির রোগটা ধরতে পারতাম না। আরেট্টু দেকে বিশ কিলোমিটার দূরের এক টাউন থিকে গ্যারেজের মিস্তিরি ধরে আনতে হত।'

হরেনের কথা তেমন একটা কানে তুললেন না দিবাকর। এদিকে সেই সুপুরুষ প্রৌঢ়টি এবং তাঁর সঙ্গীরা কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে।

প্রৌঢ়টি দিবাকরকে বললেন, 'আপনি কী উপকার যে করলেন বলে বোঝাতে পারব না। উই আর সো গ্রেটফুল।'

দিবাকর হাত নেড়ে বললেন, 'কীসের উপকার? আপনাদের গাড়ির ইঞ্জিনটা ঝামেলা করছিল। সেটা ঠিক করে দিলাম। এর জন্যে অত কৃতজ্ঞতা জানাবার দরকার নেই।'

'স্যার, আপনারা কারা কিছুই জানি না।'

'পরিচয় জানতে চাইছেন? ঠিক আছে। আমি হলাম আর্মি অফিসার কর্নেল দিবাকর লাহিড়ি। আমার এই বন্ধুরা হলেন মণিময় সরকার, ইঞ্জিনিয়ার আর শুভেন্দু বসু—ব্যাঙ্ক অফিসার।'

প্রৌঢ়ও তাঁদের পরিচয় দিতে লাগলেন। তাঁর নাম সুকুমার দত্ত। তাঁর যে সঙ্গীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের এক-একজনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে নামতা পড়ার মতো বলতে লাগলেন, 'ইনি অমিতাভ বসু, ইনি ইন্দিরা চ্যাটার্জি, ইনি পারমিতা—'

হাত তুলে সুকুমারকে থামিয়ে দিয়ে দিবাকর বললেন, 'একসঙ্গে এত

নাম মনে রাখার মতো স্মৃতিশক্তি আমার নেই।' কথা বলছিলেন ঠিকই, তবে তাঁর এবং মণিময়দের চোখ ভিড়ের ভেতর একটি তরুণীর দিকে চলে যাচ্ছিল। তেইশ চব্বিশের বেশি হবে না তাঁর। এমন পরমাশ্চর্য সুন্দর মেয়ে ক্বচিৎ কখনও চোখে পড়ে। যেন অলৌকিক কোনও পরী।

দিবাকর মেয়েটির দিক থেকে চোখ সরিয়ে বাসের ছাদে হাঁড়ি কড়া গ্যাস সিলিন্ডার এবং রান্নাবান্নার বিপুল সরঞ্জামের দিকে আঙুল বাড়িয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আপনারা কি কোথাও পিকনিক টিকনিকে চলেছেন?'

সুকুমার বললেন, 'হ্যাঁ, কর্নেল স্যার।' তিনি আরও জানালেন, এখান থেকে আশি পঁচাশি কিলোমিটার দূরে এক স্টিল প্ল্যান্টের তাঁরা এমপ্লয়ি। ফি বছর শীত পড়ার মুখে মুখে ঘনিষ্ঠ পনেরোটি ফ্যামিলির সবাইকে নিয়ে পিকনিক করতে বেরোন। সারাদিন হই হই করে কাটিয়ে রাত্তিরে স্টিল প্ল্যান্টের টাউনশিপে ফিরে যান। এক-এক বছর এক-এক জায়গায় যান তাঁরা। এবার চলছেন বেতাই নদীর ধারে চমৎকার একটা পিকনিক স্পটে।

সব জানানোর পর সুকুমার জিগ্যেস করলেন, 'আপনারা কোথায় যাবেন স্যার?'

দিবাকর বললেন, 'আমাদের ডেফিনিট কোনও ডেস্টিনেশন নেই।' একটু থেমে ফের শুরু করেন, 'আসলে আমাদের হাতে সময় খুব বেশি নেই। তাই এই ওয়ার্ল্ডটাকে শেষবারের মতো দেখার জন্যে বেরিয়ে পড়েছি। যখন যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে যাব।'

এমন অদ্ভুত মানুষ আগে আর কখনও দেখেন নি সুকুমাররা। দিবাকর যা বললেন তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারেন তাঁরা।

দিবাকর কথা বলছিলেন ঠিকই, তাঁর মস্তিষ্কে স্বয়ংক্রিয় একটা মেশিন কিন্তু পুরোদমে চলছিল। বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, একটা অনুরোধ করব।'

গভীর আগ্রহে সুকুমার বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'আপনাদের বনভোজন পার্টির সঙ্গে আমরা তিন জন যদি আজকের দিনটা কাটাই, আপত্তি হবে?'

কয়েক মুহূর্ত থ হয়ে থাকেন সুকুমার। তারপর ভীষণ ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন, 'আপনাদের পেলে আমরা খুব খুশি হব। এ তো আমাদের বিরাট সৌভাগ্য—'

তাঁর সঙ্গীরাও গলা মিলিয়ে সায় দিল।—'আপনাদের পেলে আনন্দটা একশো গুণ বেড়ে যাবে।'

দুই ভুরু উঁচুতে তুলে রগড়ের সুরে দিবাকর বললেন, 'আবার ভাববেন না তো কী হ্যাংলা সব লোক! ঘাড়ের ওপর চেপে নেমন্তন্নটা জোর করে আদায় করে নিল।'

হাত এবং মাথা ঝাঁকিয়ে সবাই কোরাসে বলতে থাকে।—'না না না, কক্ষনো না।'

দিবাকর কী বলতে যাচ্ছিলেন, আচমকা তুমুল হইচই কানে ভেসে এল। সচকিত দিবাকররা দেখতে পেলেন, লেভেল ক্রসিংয়ের দু'ধারের গেট এখনও বন্ধ। ট্রেন আসার কোনও লক্ষণই নেই। কিন্তু রেললাইনের তলায় পেতে রাখা সারি সারি কাঠের স্লিপারে পা ফেলে ফেলে একটি যুবতী ঊর্ধ্বশ্বাসে ডান দিক থেকে এসে ছুটতে ছুটতে বাঁ দিকে চলেছে। ত্রস্ত, আতঙ্কগ্রস্ত। তার চুল এবং শাড়ির আঁচল উড়ছে।

চকিতে মনে পড়ে গেল, কাল ঠাকুরবাবার মেলায় মেয়েটিকে লহমার জন্য দেখেছিলেন। কালও এই শাড়িটাই পরে ছিল সে। খোঁপায় ছিল ফুলের সাজ। ফুল টুল এখন নেই, খোঁপাও ভেঙে গেছে।

কাল থেকেই কি মেয়েটা এভাবে ছুটছে? মণিময় এবং শুভেন্দুও তাকে চিনতে পেরেছিল। উদ্বিগ্ন, চাপা গলায় পাশ থেকে মণিময় বললেন, 'কালকের মেলার সেই মেয়েটা না?'

আস্তে মাথা নাড়েন দিবাকর। দূরে, আরও দূরে আদিগন্ত ধানখেতের দিকে দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। সেদিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। কালও মেয়েটার জন্য কিছু করতে পারেন নি, আজও কিছুই করা গেল না। কেননা, তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে দৌড়ে গিয়ে তার কাছে পৌঁছনো অসম্ভব। ওধারে পাকা রাস্তাও নেই যে মোটর ছুটিয়ে ওকে ধরে ফেলবেন। জানতে চাইবেন তার সমস্যাটা কী। তেমন বুঝলে তাকে বাঁচাতে

চেষ্টা করবেন। কিন্তু কোনও উপায়ই নেই। তীব্র অক্ষমতা দিবাকরকে ভেতরে ভেতরে অস্থির করে তোলে।

শুভেন্দু বলল, 'কাল কতকগুলো জানোয়ার ওকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল। আজ তাদের দেখছি না। তা হলে—'

তার কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল কালকের মতো ক'টা লোক—হাতে তাদের লাঠি, দা এবং বন্দুক—ডান দিক থেকে ঝড় তুলে দৌড়ে আসছে। কালকের সেই লোকগুলোই। যেন এক দঙ্গল হিংস্র চিতা।

মণিময় বিষাদগ্রস্তের মতো বললেন, 'কাল থেকেই ওরা বোধহয় মেয়েটাকে ধাওয়া করে চলেছে। চোখের সামনে ব্যাপারটা দু' দু'বার ঘটল কিন্তু কিছুই করা গেল না দিবাকরদা।'

দিবাকর এবারও উত্তর দিলেন না। প্রবল আক্ষেপে নিজেকে লক্ষ বার ধিক্কার দিতে লাগলেন।

একসময় ধান খেতের ভেতর মিলিয়ে গেল মেয়েটা। তারও কিছুক্ষণ পর সশস্ত্র বাহিনীটাও অদৃশ্য হল।

মণিময়দের নিচু গলার কথাবার্তার টুকরো টাকরা শুনতে পেয়েছিলেন সুকুমার। কিছু একটা আন্দাজ করে নিয়ে বললেন, 'কর্নেল স্যার, আপনারা কি ওই মেয়েটাকে চেনেন?'

দিবাকর বললেন, 'না। কাল একবার মাত্র দেখেছিলাম।' যার জন্য কিছুই করা যায় নি তাকে নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না তাঁর।

অপার কৌতূহলে সুকুমার ফের কী বলতে যাচ্ছিলেন, গম্ভীর ঝড়াং ঝড়াং আওয়াজ তুলে, চারপাশ কাঁপিয়ে ডান দিক থেকে ট্রেন এসে পড়ল। জাঁদরেল এক মালগাড়ি। তেমন স্পিড নেই, তবে একটানা গর্জন আছে।

দিবাকর বললেন, 'গুডস ট্রেনটা চলে গেলে লেভেল ক্রসিংয়ের গেট খুলে যাবে। আপনারা বাসে গিয়ে উঠুন। আমরাও গিয়ে গাড়িতে উঠছি। পিকনিক স্পটটা চিনি না। আপনারা আগে আগে যাবেন। আমরা আপনাদের ফলো করব।'

সুকুমারদের গ্রুপে যে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েগুলো ছিল তারা দুড়দাড় করে লাক্সারি বাসটায় উঠে পড়ল। তাদের পেছন পেছন তরুণ তরুণী এবং বয়স্করা। দিবাকররাও নীল অ্যামবাসাডরে ফিরে গেলেন।

বিশাল লোহার সরীসৃপের মতো মালগাড়িটা রেললাইনে কর্কশ, ধাতব শব্দ করতে করতে চলছে তো চলেছেই। লেভেল ক্রসিংটা পার হতে অনেকখানি সময় লেগে গেল সেটার। তারপর গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে হাইওয়ের দু'ধারে যেসব ট্রাক বাস মিনিবাস ট্রেকার ফ্রেকার লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেগুলো খানিক জিরোবার পর বিপুল এনার্জি নিয়ে দৌড় শুরু করল।

আগের মতোই শুভেন্দু স্টিয়ারিং হাতে বসেছে। ফ্রন্ট সিটের মাঝখানে রয়েছেন মণিময় আর জানালার ধার ঘেঁষে দিবাকর।

সুকুমারদের লাক্সারি বাসের পেছন পেছন, সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে, গাড়ি চালাচ্ছে শুভেন্দু। জানালার বাইরে তাকিয়ে আছেন দিবাকর। অন্যমনস্ক, বিষণ্ণ। বার বার সেই মেয়েটার ত্রস্ত, ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের দৃশ্যটা তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল।

সাত

বেতাই নদীর ধারে পিকনিক স্পটে সুকুমারদের লাক্সারি বাসের পিছু পিছু দিবাকররা যখন পৌঁছলেন, তখন ন'টাও বাজে নি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কেটে গেছে। রোদের উষ্ণতাও বেড়েছে।

বেতাই মাঝারি ধরনের নদী, খুব একটা চওড়া নয়। ওপারটা আবছাভাবে দেখা যায়। মনে হয় মোটা ব্রাশ টেনে কেউ যেন সবুজ রঙের লম্বা লাইন টেনে রেখেছে। বোঝাই যায়, ওধারে প্রচুর গাছপালা।

গাছগাছালি এধারেও কম নয়। বিশাল বিশাল সব বনস্পতি ডালপালা ছড়িয়ে বুঝিবা কয়েক শো' বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলোর মাথায় কত যে পাখি কলর কলর করতে করতে সামনে উড়ছে।

খুব শান্ত নদী বেতাই। হিমঋতু জাঁকিয়ে পড়ার আগে আগে এই সময়টা স্রোত নেই বললেই হয়। জলও কাচের মতো স্বচ্ছ।

এমন আশ্চর্য এক পিকনিক স্পট ভূ-ভারতে কোথাও যে থাকতে পারে, দিবাকররা ভাবতে পারেননি। মন ভাল হয়ে গেল তাঁদের।

দিবাকররা আসার আগেই আরও ক'টা পিকনিক পার্টি এখানে পৌঁছে গেছে। বড় বড় গাছের তলায় তারা বনভোজনের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে।

লাক্সারি বাস থামতেই হুড়মুড় করে সবাই নেমে পড়েছিল। দিবাকররাও গাড়ি 'লক' করে নেমে পড়লেন।

সুকুমার এবং আরও কয়েকজন প্রৌঢ় দিবাকরদের কাছে চলে আসেন। তারা আপ্যায়নের সুরে বলেন, 'একটু কষ্ট করে দাঁড়াতে হবে স্যার। এক্ষুনি বসবার ব্যবস্থা হচ্ছে। দশ মিনিটের ভেতর চা হয়ে যাবে। আধ ঘণ্টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট।'

সুকুমারদের কাজের লোকেরা দারুণ করিৎকর্মা। চোখের পলকে তারা প্লাস্টিকের অনেকগুলো চেয়ার, হালকা টেবল এবং বেশ ক'টা জুট কার্পেট নামিয়ে এনে পেতে দিল। ওদিকে রাঁধুনের জোগাড়েরা গ্যাস জ্বালিয়ে

চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছে। কেউ লুচির জন্য ময়দা ঠাসতে লাগল, ঢেউ ভাজার জন্য ঝিরি ঝিরি করে আলু আর চাক চাক করে বেগুন কাটা শুরু করল। লুচি দিয়ে খাওয়া হবে।

চেয়ারে দিবাকরদের বসিয়ে শুধু সুকুমারই না, আরও অনেকে তাঁদের ঘিরে বসলেন। মহিলারাও রয়েছেন। যুবক যুবতীরা অবশ্য বসেনি। তারা দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছেলেমেয়েগুলো ধারে কাছে নেই। তারা খেলার নানা সরঞ্জাম নিয়ে এসেছিল। এর মধ্যেই একটা দল মেয়েদের দু'টো ব্যাডমিন্টনের নেট টাঙিয়ে খেলা শুরু করেছে। ছেলেরা দু'টো টিম করে ওয়ান-ডে ক্রিকেটের তোড়জোড় চালাচ্ছে।

এদিকে দিবাকর আসর বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। বলছিলেন, 'তখন হাইওয়ের ধারে ভাল করে আলাপ টালাপ করার মতো অবস্থা ছিল না। এবার পরিচয়টা সেরে নেওয়া যাক। আমাদের কথা তো আগেই বলেছি। সুকুমারবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে। এখন আপনাদের সম্বন্ধে জানতে চাই।'

বয়স্করা জানালেন তাঁদের কেউ অবনীশ দত্ত, কেউ পরিমল বসাক, কেউ দেবনাথ মল্লিক, ইত্যাদি। মহিলাদের কারও নাম জয়ন্তী, কারও অরুণা, কারও মানসী, ইত্যাদি। তরুণ তরুণীরা হল শর্মিলা, স্নেহা, মালবী সঞ্জয়, অনির্বাণ, ইত্যাদি। আর সেই পরীর মতো মেয়েটি সোহিনী। সে সুকুমার দত্ত'র মেয়ে।

প্ল্যাস্টিকের গেলাসে চা এবং বিস্কুট এসে গেল। খেতে খেতে গল্পও চলছে। দিবারকদের সম্পর্কে সুকুমার দত্তদের অপার কৌতূহল। তাঁদের বাড়ি কোথায়, কোন কোন অঞ্চলে তাঁরা পোস্টেড, এদিকে কোনও কাজে এসেছিলেন কি না, এমনি নানা প্রশ্ন চার পাশ থেকে ধেয়ে আসতে লাগল। সবচেয়ে বেশি আগ্রহ শুভেন্দু সম্পর্কে। সেটা বিশেষ করে সুকুমার এবং তাঁর স্ত্রী রেণুকার।

নিজেদের রোগ এবং হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসা ছাড়া আর সমস্ত কিছুই ঠিকঠাক বলে গেলেন দিবাকর।

ওঁদের কথাবার্তার মধ্যেই শক্ত কাগজের প্লেটে ব্রেকফাস্ট নিয়ে এল রাঁধুনে বামুন আর তার অ্যাসিস্টান্টরা। লুচি, বেগুন এবং আলুভাজা। সেই

সঙ্গে বড় তালশাঁস সন্দেশ। 'লাইফলাইন ক্যানসার হসপিটাল'-এর ডাক্তার অ্যান্টনি এসব খাবারের ওপর অনেক আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।

মণিময় দিবাকরের কানের কাছে মুখ এনে নিচু গলায় ফিস ফিস করলেন, 'কাল বেগুনি ফুলুরি খিচুড়ি টিচুড়ি খাওয়া হয়েছে। আজ আবার লুচি! অনিয়মটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না দিবাকরদা?'

লুচির প্লেটটা হাতে নিয়ে দিবাকর হাসলেন।—'অনিয়মের ফ্লাডগেট তো খুলেই গেছে। বাকি চারটে দিন এরকমই চলুক। তারপর হাসপাতালে ফিরলে ডাক্তার অ্যান্টনি ফের হাতে পায়ে জিভে লাগাম পরিয়ে দেবেন। নিয়ম ভাঙার ভেতর মজা আছে, বুঝলে হে।'

মণিময় একটু হাসলেন শুধু। আর কোনও প্রশ্ন করলেন না।

ব্রেকফাস্ট শেষ হলে সুকুমার দিবাকরকে বললেন, 'স্যার, আমরা চাল ডাল মশলা আনাজ মাংস ঘি তেল, সবই সঙ্গে এনেছি। শুধু মাছটাই বাদ। কাছাকাছি একটা বড় হাট আছে, সেখানে টাটকা মাছ পাওয়া যায়। অবনীশ আর পরিমলকে নিয়ে আমি মাছ কিনে নিয়ে আসি। বাকি সবাই তো রইল। আপনারা গল্প টল্প করুন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা ফিরে আসব।'

দিবাকর কী একটু ভাবলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'হাট এখান থেকে কতদূর? কীভাবে যাবেন?'

সুকুমার জানালেন, হাটটা বেশি দূরে নয়, বড় জোর দু'কিলোমিটার। বড় রাস্তায় গেলেই সাইকেল রিকশা পাওয়া যাবে।

দিবাকর বললেন, 'আমাদের সঙ্গে 'কার' আছে। অনেক দিন গ্রামের দিন হাট টাট দেখা হয়নি। চলুন, আপনাদের সঙ্গে ঘুরে আসি।'

'আপনারা আবার কষ্ট করে যাবেন?'

'কষ্ট কিসের। গাড়িতেই তো যাব। চলুন—চলুন—' দিবাকরের এমন এক প্রবল ব্যক্তিত্ব রয়েছে যে তাঁর মুখের ওপর 'না' বলা যায় না। সুকুমার বললেন, 'আচ্ছা, চলুন—'

সুকুমারদের সঙ্গে করে দিবাকররা তাঁদের নীল অ্যামবাসাডরে গিয়ে উঠলেন। তারপর তিনজনে সকালের ওষুধ খেয়ে নিলেন। এবার মণিময় স্টিয়ারিং ধরে বসেছেন। সুকুমারকে বললেন, 'কোন দিক দিয়ে যেতে হবে বলে দিন—'

দশ মিনিটের ভেতর ওঁরা হাটে পৌঁছে গেলেন। বিশাল এলাকা জুড়ে হাটটা। কত যে দোকানপাট তার লেখাজোখা নেই। চারিদিক একেবারে গম গম করছে।

ভিড় ঠেলে ঠেলে মাছের বাজারে চলে এলেন সুকুমাররা। সত্যিই এলাহি ব্যাপার। ব্যাপারিরা তরতাজা মাছ টাল দিয়ে রেখেছে। রুই কাতলা কালবোস তো রয়েছেই, আছে ইলিশ বাটা পাবদা ট্যাংরা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দিবাকর দু'টো বিরাট আকারের কাতলা আর একজোড়া ঝকঝকে রুপোলি ইলিশ বেছে নিলেন। কাতলা দু'টোর ওজন সাড়ে ছ'কিলো। আর ইলিশ তিন কিলো ছ'শো গ্রাম। সব মিলিয়ে দাম চোদ্দশো পঁচিশ।

সুকুমার পার্সের জন্য পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছিলেন, চোখ পাকিয়ে ধমকের সুরে দিবাকর বললেন, 'নো নো, হাত বার করুন—'

সুকুমার থতমত খেয়ে যান। মিনমিনে গলায় বলেন, 'এটা কিরকম হল স্যার! না না, প্লিজ। আপনারা আমাদের গেস্ট—'

সামরিক অফিসার এবার হুঙ্কার ছাড়েন।—'কীসের গেস্ট? আমরা তো জোর করে আপনাদের টিমে ঢুকে পড়েছি। আনন্দটা শেয়ার করব বলেই না? আপনারা এত খরচ করেছেন, আমরাও না হয় শেয়ার একটু আধটু করলাম। তা হলে মনে হবে আমরা আপনাদের টিমেরই মেম্বার।' বলে শুভেন্দুর দিকে তাকালেন। 'কাল থেকে মণিময় আর আমি খরচ করে চলেছি। তুমিও সামান্য খরচ করেছ। মাছের টাকাটা তুমি দাও।'

শুভেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' সে মানিব্যাগ বার করে। এরপর আর কী-ই বা বলা যায়? কী-ই বা করতে পারেন সুকুমাররা? তাঁরা বিরাট বিরাট চটের ব্যাগ নিয়ে এসেছিলেন। মাছ কাটিয়ে, দাম মিটিয়ে পিকনিক স্পটে এসে দেখা গেল রান্নাবান্না শুরু হয়ে গেছে পূর্ণোদ্যমে। আর বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাদের একটা গ্রুপ জুট কার্পেটে বসে গুলতানি করছে। একদল গেছে নদীর ধারে। তরুণ-তরুণীরা ছোট ছোট দঙ্গলে ভাগ হয়ে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। সেই সঙ্গে কোনও মজার কথায় হুল্লোড় বাধাচ্ছে। আর সমানে হাসি। হা হা, হি হি। বাচ্চাগুলো ক্রিকেট আর ব্যাডমিন্টন নিয়ে মেতে আছে। সবাই রয়েছে ফুরফুরে মেজাজে।

দিবাকররা মাছ নিয়ে সোজা রান্নার জায়গায় চলে গেলেন। রাঁধুনে বামুনটির নাম ত্রিলোচন পাণ্ডা। মেদিনীপুরের লোক। গোলগাল ফর্সা নাড়ুগোপাল মার্কা চেহারা। বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। পরনে খাটো ধুতি, হাফ-হাতা পাঞ্জাবির ওপর ঢলঢলে উলের সোয়েটার। মুখ পানে বোঝাই।

দিবাকর জিগ্যেস করলেন, 'উনুনে কী রান্না চাপিয়েছ?'

ত্রিলোচন খুবই বিনয়ী। বলল, 'আইজ্ঞা আলুকপির ডালনা আর চাটনি। চাটনিটা হয়ে এসেছে।'

'চাটনি হয়ে গেলে এখন আর কিছু চাপিও না। মাছ এনেছি। তোমার অ্যাসিস্টান্টদের দিয়ে মাছগুলো চটপট নুন হলুদ মাখিয়ে ফেলার ব্যবস্থা কর।'

'আচ্ছা আইজ্ঞা—'

'একটা গ্যাস-উনুন আমাকে ছেড়ে দিও। রুই মাছটা আমি রাঁধব।'

ত্রিলোচনের চোখ এমনিতেই গোল গোল। সে দু'টো আরও গোলাকার হয়ে গেল। সুকুমাররা সঙ্গেই দিলেন। তাঁরাও কম অবাক হননি। এঁরা জানেন না, দিবাকরের রান্নার হাতটি বেশ পাকা। আর্মিতে থাকতে মাঝে মাঝে অন্য অফিসার এবং তাঁদের স্ত্রীদের মাছ বা মাংসের নানা রকম পদ রান্না করে খাইয়েছেন।

ত্রিলোচন হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। তাকে রীতিমতো ধমকই দিলেন দিবাকর।—'অমন করে কী দেখছ! যা বললাম কর। একটা জোগাড়েকে দিয়ে মাছগুলো ধোওয়াও। আর একটাকে দিয়ে এক কিলো পেঁয়াজ আড়াই শো গ্রাম আদা আর দেড়শো গ্রামের মতো গরম মশলা বাটাও।

ত্রিলোচন ব্যস্ত হয়ে পড়ে।—'এই গুপে, এই কেষ্টা হাত লাগা। বড় সায়েব যা বলেচেন করতে থাক।' দিবাকরের ছ'ফিটের ওপর হাইট, গমগমে কণ্ঠস্বর আর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, এসব দেখে তাঁকে বড় সায়েব বলাই সমীচীন মনে হয়েছে তার।

গুপী এবং কেষ্ট—ত্রিলোচনের দুই শাগরেদ মুহূর্তে কাজে লেগে যায়।

এদিকে দিবাকর যে মাছ রাঁধবেন, সেই ঘোষণাটি চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। সুকুমারদের পিকনিক পার্টিতে যে বয়স্ক মহিলা এবং পুরুষেরা

এসেছেন তাঁরা তো বটেই, তরুণ-তরুণীরাও অনেকে এসে দিবাকরদের চারপাশে ভিড় জমাল।

তিনটে উদ্ভট ধরনের মানুষ নেহাতই অযাচিতভাবে সুকুমারদের বনভোজনের দলে ঢুকে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে সব চেয়ে বিস্ময়কর দিবাকর। এই আর্মি অফিসারটি কিনা মাছ রাঁধবেন! সেই বস্তুটি কেমন দাঁড়াবে, খাওয়ার যোগ্য হবে কিনা, তাই নিয়ে চাপা গলার মজাদার টিপ্পনি চলছিল চারপাশে। সেসব কানে আসছিল দিবাকরের। কিন্তু তিনি টুঁ শব্দটিও করলেন না। গুপী আর কেষ্টর কাজকর্মের তদারকি করতে লাগলেন।—'এই অত নুন দিও না, হলুদটা আর দু' হাতা দাও। বেশ ভাল করে মাছে মাখো—'

একটি সুশ্রী মহিলা, বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশ, দিবাকরের কাছে চলে এলেন। আগেই পরিচয় হয়েছিল। নাম ইন্দিরা। তিনি বললেন, 'দাদা, আমি কি আপনাকে হেল্প করতে পারি?'

ইন্দিরার দেখাদেখি আরও কয়েকজন মহিলা এগিয়ে আসেন। এঁরাও তাঁকে রান্নায় সাহায্য করতে চান। এঁদের নামও তাঁর জানা। জয়ন্তী সুলতা রমলা, ইত্যাদি। প্রথম দিকে এঁরা স্যার বলছিলেন দিবাকরকে। এখন সম্পর্কটা অনেকটাই ঘনিষ্ঠ হয়েছে। সবাই দাদা বলছেন। সেটা ভালই লাগল দিবাকরের। কিন্তু মাছ রান্নার ব্যাপারে এই যে এতজন মহিলা সাহায্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তার পেছনে আসল উদ্দেশ্যটা কী? একটা খটকা দেখা দিল দিবাকরের মনে। এঁরা কি ভাবছেন, মাছের পিণ্ডি পাকিয়ে ফেলবেন তিনি? তাই তাঁকে সামনে রেখে রান্নাটা ওঁরাই করতে চাইছেন কি? এতে রাঁধিয়ে হিসেবে তাঁর অহংবোধটা বাঁচবে আর মাছ খেয়ে সবাই যথেষ্ট তারিফও করবে।

কিন্তু অন্যের কৃতিত্ব অন্যের বাহাদুরি নিতে চান না দিবাকর, যেহেতু রান্নাটা তিনি ভালই জানেন। ভুরু কুঁচকে কয়েক পলক কী চিন্তা করে বললেন, 'দিদিরা, হেল্প করতে পারেন কিন্তু এক কন্ডিশনে—'

'কী কন্ডিশন?' ইন্দিরারা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে জানতে চান।

'আমি যা বলব শুধু সেটুকুই করবেন। নিজেদের আলাদা কেরামতি দেখাবার চেষ্টা করবেন না। মনে থাকবে?'

ইন্দিরারা টের পেলেন, ধরা পড়ে গেছেন। সামরিক অফিসারটিকে ধোঁকা দেওয়া যায়নি। হেসে হেসে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনার হুকুমই তামিল করা হবে।'

এরপর দিবাকরের নির্দেশ মতো মাছের টুকরোগুলো লাল করে ভেজে ফেললেন ইন্দিরারা। তারপর আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, লঙ্কার গুঁড়ো এবং অন্যান্য মশলা ভাল করে ভেজে বিশাল কড়াইতে মাছ ছেড়ে পরিমাণ মতো জল দেওয়া হল। ইন্দিরারাই শুধু নন, মাঝে মাঝে তাঁদের সঙ্গে হাত লাগালেন দিবাকরও।

ওধারে অন্য একটা গ্যাস ওভেনে সর্ষে-ইলিশ শেষ করে মাংস চাপিয়ে দিয়েছে ত্রিলোচন।

রান্নার পর্ব চুকতে চুকতে ঘণ্টা দুই লেগে গেল। তারপর দিবাকর বললেন, 'নদীতে স্নান করে আসা যাক। অনেকদিন জলে নেমে সাঁতার টাঁতার কাটা হয়নি।'

ইন্দিরারা রাজি হলেন না। নদীতে খোলা জায়গায় সবার চোখের সামনে মেয়েদের পক্ষে স্নান করাটা দৃষ্টিকটু বলেই বুঝিবা তাঁদের আপত্তি। ছোটদেরও জলে নামতে দেওয়া হল না।

তবে পিকনিক পার্টির পুরুষেরা, মাঝবয়সী থেকে কিশোর এবং যুবক, সবাই হই হই করে দিবাকরদের সঙ্গে নদীতে নেমে পড়ল।

দিবাকর খুব ভাল সাঁতার জানেন। তবে তাঁর অপারেশন হয়েছে, কেমো চলছে, সেসব মাথায় রেখে একেবারেই ঝাঁপাঝাঁপি করলেন না। হাত-পায়ের কায়দায় শরীর ভাসিয়ে ভাসিয়ে মাঝ-নদী অব্দি চলে গেলেন। মণিময় আর শুভেন্দু সাঁতার জানে না। তারা কোমর সমান জলে নেমে বার বার ডুব দিতে লাগলেন।

পিকনিক পার্টির প্রৌঢ় থেকে যুবক, সকলেই সাঁতার জানে। বেতাই নদী উথাল পাতাল করে ঘণ্টাখানেক বাদে সবাই জল থেকে উঠল।

ত্রিলোচনরা তৈরি হয়েই ছিল। সবুজ ঘাসের জমির ওপর অনেকগুলো শতরঞ্চি লম্বালম্বি ভাঁজ করে মুখোমুখি দু'টো লাইন করে পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছে। দুই লাইনের মাঝখানে বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা।

প্লেট ট্রেট নেই। শালপাতার থালার মাঝখানে কলাপাতা গোল করে কেটে সাঁটা। সেগুলো আর মাটির গেলাস শতরঞ্চির আসনে সামনে পর পর সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

দিবাকররা গা-মাথা মুছে, চুল আঁচড়ে, পোশাক পালটে খেতে বসে গেলেন। ত্রিলোচন এবং তার দুই অ্যাসিস্টান্ট নিপুণ হাতে পাতে পাতে ভাত ডাল ভাজা তরকারি মাছ টাছ দিয়ে যেতে লাগল।

হুল্লোড় বাধিয়ে নানা রকম মজা করতে করতে খাওয়া চলল।

দিবাকরের রান্না কাতলা মাছের কালিয়া খেয়ে সবাই দারুণ উচ্ছ্বসিত। চারিদিক থেকে কোরাসে গুণকীর্তন শুরু হয়ে গেল।

ইন্দিরা বললেন, 'দাদা, আপনার হাতে ম্যাজিক আছে। এমন হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া দরকার।'

মানসী বললেন, 'এমন কালিয়া আগে আর কখনও খাই নি।'

সুকুমারের স্ত্রী রেণুকা বললেন, 'একশো জন্ম চেষ্টা করলেও এমন কালিয়া আমি রাঁধতে পারতাম না।'

দেবনাথ বললেন, 'আর্মিতে না গিয়ে আপনার ফাইভ-স্টার হোটেলের শেফ হওয়া উচিত ছিল। একেবারে কামাল করে দিতে পারতেন।'

দিবাকর লক্ষ করলেন, এখন আর কেউ স্যার বলছে না। তিনি 'দাদা' হয়ে গেছেন। অনাত্মীয় এই মানুষগুলো সম্পর্কটা অনেক ঘনিষ্ঠ করে নিয়েছে। তাঁর বেশ ভাল লাগল। মিটি মিটি হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, 'আর আমাকে আকাশে তুলবেন না। কান লাল হয়ে উঠেছে।'

•

খাওয়া দাওয়া মিটলে রেণুকা বললেন, 'দাদা, প্রত্যেক বছর এই সময়টা আমরা এখানে পিকনিক করতে আসি। দুপুরে খাওয়ার পর ছেলেরা আর মেয়েরা আলাদা আলাদা দু'টো গ্রুপ করে অন্ত্যাক্ষরি গাওয়া হয়। আপনাদের তিনজনকে কিন্তু পার্টিসিপেট করতে হবে।'

'আমি গান গাইব!' নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে আঁতকে উঠলেন দিবাকর।—'আমি হাঁ করলে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট আর মেশিন গানের আওয়াজ বেরোয়। গান গাইতে বললে আমার স্ট্রোক হয়ে যাবে।'

মণিময় টের পাচ্ছিলেন এবার তাঁকেই টার্গেট করা হবে। সভয়ে বলে উঠলেন, 'আমিও দিবাকরদার দলে। হোল লাইফ মেশিন টেশিন নিয়ে আমার কারবার। গানের সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক নেই। তবে শুভেন্দু ভাল গাইতে পারে। একসময় শিখত। ওকেই বরং ধরুন—'

মণিময়ের কথা শেষ হবার আগেই ইন্দিরা মানসী সুকুমার দেবনাথ রেণুকারা শুভেন্দুকে ছেঁকে ধরলেন। তাকে অন্ত্যাক্ষরি গাইতেই হবে।

দিবাকর লক্ষ করলেন পিকনিক পার্টির বাকি সকলে, বিশেষ করে তরুণীরা অপার কৌতূহলে শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে আছে। তবে আগ্রহটা সব চাইতে বেশি সুকুমার আর রেণুকার মেয়ে সোহিনীর।

শুভেন্দু মিনমিনে গলায় বলে, 'সেই কবে কিছুদিন শিখেছিলাম। এখন আর প্র্যাকটিস নেই। সব ভুলে টুলে গেছি। গাইতে গেলে বেসুরো হয়ে যাবে। আমাকে ছেড়ে দিন।'

কিন্তু ছাড়ছে কে? কোনও অজুহাতেই পার পাওয়া গেল না। একরকম জোরজার করেই শুভেন্দুকে পুরুষদের গ্রুপে ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

জুট কার্পেটগুলো আগেই পেতে রাখা ছিল। ঠিক হল মেয়েরা একদিকে বসবে, ছেলেরা বসবে তাদের মুখোমুখি। কিন্তু ঝামেলা বাধল, শুরুটা করবে কারা? মেয়েরা, না পুরুষেরা? দু'দলেরই দাবি তারা আগে আরম্ভ করবে। এই নিয়ে তুমুল হইচই বেধে গেল।

খানিকক্ষণ দু'টো দলকেই লক্ষ কবলেন দিবাকর। তারপর দু'হাত তুলে গমগমে গলায় বললেন, 'নো নো, ঝগড়া নয়—পিস। শান্তি শান্তি।' আমি একটা ফরমুলা দিচ্ছি, দেখুন আপনাদের পছন্দ হয় কিনা।'

চেঁচামেচি থামিয়ে দু'পক্ষই দিবাকরের দিকে তাকায়।—'কী ফরমুলা?'

'আমি পুরোপুরি নিউট্রাল, কোনও পক্ষেই নেই। বলছিলাম টস করা যাক। যারা জিতবে, শুরুটা তারাই করবে।'

দু'দলই গলা মিলিয়ে সায় দিল।—'ভেরি গুড সলিউশন।'

পকেট থেকে এক টাকার একটা কয়েন বার করে বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর টোকায় ওপর দিকে ছুঁড়ে দিতে সেটা যখন নেমে এসে বাঁ হাতের তেলোতে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতে সেটা চেপে ধরলেন দিবাকর। জিগ্যেস করলেন, 'বলুন—হেড না টেল?'

ইন্দিরা যেন ওত পেতেই ছিলেন। দিবাকরের মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরুতে না-বেরুতেই বলে উঠলেন, 'হেড—'

দিবাকর ডান হাত তুলতেই দেখা গেল, সত্যিই হেড।

অগত্যা কী আর করা? টসে ছেলেদের হার মেনে নিতেই হল। তারপর চটপট দু'দল মুখোমুখি বসে পড়ে।

দিবাকর হাত তুলে বললেন, 'নাউ স্টার্ট—'

প্রথমেই মেয়েদের তরফে ইন্দিরা গাইতে শুরু করলেন : 'বন্ধু তিন দিন তোর বাড়িত্ যাইলাম, দেখা হইল না—' এই অব্দি গেয়ে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন।

খেলার নিয়ম অনুযায়ী গানের লাইনের শেষ অক্ষর 'ন' দিয়ে প্রতিপক্ষকে গাইতে হবে। দেবনাথ গেয়ে উঠলেন : 'নদী আপন বেগে পাগল পারা—' তাঁর গানের গলাটি মন্দ নয়, তবে বেজায় বেসুরো। বোঝাই যায় সেভাবে চর্চা টর্চা কখনও করেন নি।

'পাগল পারা'র 'র' দিয়ে মেয়েদের গাইতে হবে। অনুপমা নামে মহিলাটি গাইলেন : 'রানার চলেছে ওই ঘন্টি বাজছে হাতে, রানার চলেছে ওই খবরের বোঝা হাতে। রানার—রানার—রানার—'

শেষ অক্ষর 'র'। কিন্তু পুরুষদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। 'র' আদ্যক্ষর দিয়ে চট করে কেউ গান খুঁজে পেল না। তারা হাতড়েই চলেছে আর মেয়েরা সমানে চেঁচাতে থাকে, 'হেরে গেছে, ওরা হেরে গেছে—'

এতক্ষণ লাজুক মুখে বসে ছিল শুভেন্দু। পুরুষজাতির পরাজয় মেনে নিতে না পেরে হঠাৎ সে গেয়ে ওঠে : 'রাঙ্গিলা রাঙ্গিলা রে, আমারে ছাড়িয়া বন্ধু, কই গেলা রে—'

তার গলা আশ্চর্য সুরেলা, তাল লয় নিখুঁত। সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়।

'র' আদ্যক্ষর দিয়ে এবার মেয়েদের গাইতে হবে। সোহিনী গাইল : 'রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপ রতন তুলব বলে—' রেওয়াজি কণ্ঠস্বর।

ছেলেরা কেউ মুখ খোলার আগেই শুভেন্দু গেয়ে ওঠে : 'ললিতা গো ওকে আজ চলে যেতে বল না—'

সোহিনী গাইল : 'নিশীথে যাইও ফুল বনে যে ভ্রমরা, নিশীথে যাইও—'

শুভেন্দু গাইল : 'ও দরদী আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না—'

সোহিনী গাইল : 'নেব না সোনার চাঁপা কনকচাঁপা ফেলে—'

শুভেন্দু গাইল : 'লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া—'

'য়া'-টা 'আ' ধরে সোহিনী গায় : 'আমরা দু'জনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে—'

গাইতে গাইতে দু'জনের যেন নেশা ধরে যায়। এবং জেদও। দু'জনেরই গানের স্টক অফুরন্ত। গানের গলা চমৎকার। সমস্ত পুরুষজাতির মর্যাদা রক্ষার যাবতীয় দায় যেন শুভেন্দুর। আর মেয়েদের সম্মান যাতে অটুট থাকে সেজন্য প্রাণপণে যুঝে যাচ্ছে সোহিনী। কেউ কারও কাছে মাথা নোয়াতে রাজি নয়।

দিন ফুরিয়ে আসছে। আকাশের ঢালু গা বেয়ে গড়াতে গড়াতে সূর্যটা পশ্চিম দিকে অনেকখানি নেমে গেছে। রোদের রং এখন বাসি হলুদের মতো ম্যাড়মেড়ে। দিনের তাপাঙ্ক পড়ে যাচ্ছে দ্রুত, দুপুরের সেই উষ্ণতা আর নেই। নদীর দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া উঠে আসছে। মিহি রেশমের মতো হালকা কুয়াশা নামতে শুরু করেছে সমস্ত চরাচর জুড়ে।

ঘণ্টা দুই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর তুখোড় রেফারির মতো দু'হাত ওপরে তুলে দিবাকর বললেন, 'ব্যস, এখানেই থামা যাক। ব্যাটল রয়ালে কেউ হারেও নি, কেউ জেতেও নি। রেজাল্ট—ড্র।' একটু থেমে ফের শুরু করলেন, 'দিনটা হই হই করে, গানে আনন্দে মজায় চমৎকার কাটল। এবার কিন্তু আমাদের যেতে হবে।'

কিন্তু সহজে ছাড়া পাওয়া গেল না। অন্ত্যাক্ষরিতে শুভেন্দুর টুকরো টুকরো গানের কলি ইন্দিরা, মানসী, দেবনাথদের এত ভাল লেগেছে যে তাকে পুরো একখানা গান গাইবার জন্য সবাই ছেঁকে ধরল।

অগত্যা দিবাকর বললেন, 'সবাই যখন চাইছে, গেয়েই ফেল শুভেন্দু।' দেবনাথদের বললেন, 'একটাই শুধু, তার বেশি রিকোয়েস্ট করবেন না কিন্তু—' শুভেন্দুকে বললেন, 'এখানে এসে তোমার অনেক ফ্যান জুটে গেছে হে।'

শুভেন্দু জিগ্যেস করে, 'কী গান গাইব?'

'তোমার যা ইচ্ছে। এরা এতটাই মুগ্ধ যে যা গাইবে তা-ই ওদের ভাল লাগবে।'

হারমোনিয়াম, তানপুরা বা অন্য কোনও বাদ্যযন্ত্র নেই। খোলা গলায় শুভেন্দু গাইতে শুরু করল।

'এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলাম।
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে আপন-মনে
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলাম জীর্ণ পাতা
ঝরার বেলায়।।
দিনের পথিক মনে রেখো, আমি চলেছিলাম রাতে
সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে হাতে।
যখন তোমায় ওপার থেকে গেল ডেকে
ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়।
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা
ঝরার বেলায়।।'

শুভেন্দুর কণ্ঠস্বরে এমন করুণ মায়াভরা ম্যাজিক রয়েছে যে সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। অফুরান বিষাদ ঘন হয়ে চারপাশে নেমে আসে।

অনেকক্ষণ পর দিবাকর নীরবতা ভেঙে বলে ওঠেন, 'রবীন্দ্রনাথের এমন একটা গান বেছে নিলে কেন শুভেন্দু? দেখ, সবার মন খারাপ হয়ে গেছে।'

কেন যে এই গানটা ছাড়া অন্য কিছু মনে পড়ে নি, নিজেই জানে না শুভেন্দু। সে চুপ করে থাকে।

দিবাকর বললেন, 'এখন যাওয়া যাক। নভেম্বরের সন্ধে কিন্তু ঝপ করে নেমে যায়।' মণিময় আর শুভেন্দুকে নিয়ে তিনি উঠে পড়েন। খানিক দূরে তাঁদের নীল অ্যামবাসাডরটা দাঁড়িয়ে আছে। পিকনিক পার্টির উদ্দেশে হাত তুলে নাড়তে নাড়তে, তাঁরা গাড়িটার দিকে চলতে শুরু করেন।

এদিকে ইন্দিরা রেণুকা সুকুমাররাও উঠে পড়েছিলেন। তাঁরা দিবাকরদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকেন।

দেবনাথ বললেন, 'দিবাকরদা, আমাদের স্টিল প্ল্যান্টের টাউনশিপের নাম তো বলেছি। আপনারা সময় করে ক'দিন কাটিয়ে যাবেন। আমাদের ভীষণ ভাল লাগবে। এই যে এটা রাখুন, এতে আমার নাম-ঠিকানা রয়েছে।' পকেট থেকে একখানা কার্ড বার করে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, 'ওখানে গেলে আমাদের সবাইকে পেয়ে যাবেন।'

বাকি সবাই আবদারের সুরে বলল, 'আসতেই হবে কিন্তু।'

দিবাকর একটু হাসলেন।—'দেখি।'

দেবনাথ জিগ্যেস করলেন, 'এখন আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?'

'কিছুই ঠিক নেই।' দূরে হাইওয়ের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিবাকর বললেন, 'আগে ওই রাস্তাটায় গিয়ে উঠি। তারপর চলতে চলতে যেখানে টায়ার্ড হয়ে পড়ব, সেখানেই থেকে যাব। আগেও বোধহয় বলেছি, আমাদের ডেফিনিট কোনও ডেস্টিনেশন নেই।'

এমন বিচিত্র মানুষ আগে আর কখনও দেখেন নি দেবনাথ। বিমূঢ়ের মতো তিনি তাকিয়ে থাকেন। কী জবাব দেবেন, ভেবে পান না।

কিছু একটা বলার জন্য উসখুস করছিলেন সুকুমার। কিন্তু সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। দিবাকররা নীল অ্যামবাসাডরটার কাছে চলে এসেছিলেন। গাড়িতে একবার উঠে পড়লে কোনও দিনই তা বলা হবে না। প্রায় মরিয়া হয়েই ওঠেন তিনি। দিবাকরদের ঘিরে রীতিমতো ভিড়। সুকুমারের সামনে রয়েছে দু-চারজন। তাদের সরিয়ে দিবাকরেব কাছে চলে আসেন।—'আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে দাদা—'

দিবাকরকে কৌতূহলী দেখায়।—'বেশ তো, বলুন—'

তাঁর হাত ধরে জটলার ভেতর থেকে একটু দূরে নিয়ে যান সুকুমার। সবার সামনে নয়, যা বলার গোপনেই বলতে চান। নিচু গলায় জিগ্যেস করলেন, 'তখন বলছিলেন শুভেন্দু ব্যাঙ্ক অফিসার। কোন ব্যাঙ্কের?'

একটা বিখ্যাত বিদেশি ব্যাঙ্কের নাম করলেন দিবাকর।

'ওদের তো বেশ ওয়েল-টু-ডু ফ্যামিলি। মা দাদা বউদি, সবাই হাইলি কোয়ালিফাইড।'

'হ্যাঁ।'

সুকুমারের অভিপ্রায়টা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ভেতরে ভেতরে বেশ মজাই পাচ্ছিলেন দিবাকর।

সুকুমার বললেন, 'সাউথ ক্যালকাটার কোথায় ওদের বাড়ি?'

'লেকের কাছে।'

'ওদের অ্যাড্রেসটা দয়া করে দিন। আর ফোন নাম্বারটা—'

সব বুঝেও না-বোঝার ভান করে রইলেন দিবাকর। মুখটা অপার সারল্যে মাখানো। বললেন, 'ঠিকানা, ফোন নাম্বার টাম্বার দিয়ে কী করবেন?'

'ওর মা আর দাদার সঙ্গে দেখা করব। বুঝতেই তো পারছেন আমি মেয়ের বাবা। সোহিনীকে তো দেখছেন। সবাই সুন্দরী বলে। লেখাপড়ায় ভাল। গানটাও যত্ন করে শিখছে। মেয়ে বড় হয়েছে। ওর বিয়েটা হলে একটা বড় দায় থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'শুভেন্দুকে রেণুকা আর আমার খুব ভাল লেগেছে। যদি ওর সঙ্গে—মানে বুঝতেই পারছেন—'

সোহিনী একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। চকিতে দিবাকর একবার তার দিকে তাকালেন। পরীর মতো মেয়েটার ঝলমলে মুখে লাজুক একটু হাসি। সে যেন কোনও ঘোরের মধ্যে আছে। সুকুমার কেন দিবাকরকে আলাদা করে জটলা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কথা বলছেন এবং কী বলছেন সেটা খুব সম্ভব সে জানে। কতটুকু সময়েরই বা পরিচয়। তবু এরই মধ্যে শুভেন্দুকে ঘিরে সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। নইলে এমন কোমল অপার্থিব হাসি তার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত না। মনে হচ্ছে তার ভেতর থেকে সুখের ছটার মতো ওটা বেরিয়ে এসেছে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল দিবাকরের। এমন মেয়ে কচিৎ কখনও চোখে পড়ে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে নিজেই ছোটাছুটি করে শুভেন্দুর মা-বাবা-বউদির সঙ্গে কথা বলে বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলতেন। কিন্তু সুকুমাররা তো জানেন না, শুভেন্দু এমন এক রোগে ভুগছে যা কোনও দিনই সারবে না। কেমো শুরু হয়ে গেছে তার। মানুষ কত স্বপ্নই তো দেখে কিন্তু সব স্বপ্ন কি পূরণ হয়? বেশির ভাগই বিলীন হয়ে যায় অপার হতাশায়।

সোহিনীর দিক থেকে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে সুকুমারের দিকে তাকান দিবাকর। মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, 'শুভেন্দুদের বাড়িতে যোগাযোগ না করাই ভাল।'

যে উৎসাহ নিয়ে সুকুমার ফোন নাম্বার, ঠিকানা চেয়েছিলেন, লহমায় তা শেষ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু প্রায় মরিয়া হয়েই অলীক এক দুরাশাকে আঁকড়ে থাকেন সুকুমার। মলিন মুখে বলেন, 'কেন দিবাকরদা, আমার মেয়ে কি শুভেন্দুর উপযুক্ত নয়?'

দিবাকর ফের একবার চোখের কোণ দিয়ে সোহিনীকে দেখে নিলেন। যে অলৌকিক আলো তার মুখে ফুটে উঠেছিল তা নিমেষে নিবে গেছে। যে মেয়ে তার সতেজ, সুরেলা কণ্ঠের জাদুতে সবাইকে বিভোর করে রেখেছিল সে এখন এক ম্লান, বিষণ্ণ প্রতিমা। কিছুক্ষণ তাকে দেখার পর দিবাকর বললেন, 'খুবই উপযুক্ত। এ মেয়ের তুলনা নেই।'

সুকুমার জিগ্যেস করেন, ''তা হলে অসুবিধে বা আপত্তিটা কোথায়?'

'সময়।'

'মানে?'

'এই যে আমরা তিনজন—মণিময়, শুভেন্দু আর আমি—আমাদের হাতে সময় বড় কম। মাত্র ছ'মাস। মণিময় আর আমি তো বুড়োর দলে চলে গেছি। আমরা দু'জন বাদ। বাকি রইল শুভেন্দু। ইয়াং, হাইলি এডুকেটেড, ব্রাইট। তবু ওকে নিয়ে স্বপ্ন না দেখাই ভাল। আমরা কয়েক ঘণ্টা আপনাদের সঙ্গে আনন্দে কাটিয়ে গেলাম, এখানেই তা শেষ হয়ে যাক। তার জের টানার আর দরকার নেই।'

দিবাকর আর দাঁড়ালেন না। ক'পা এগিয়ে মণিময় এবং শুভেন্দুকে নিয়ে তাঁদের নীল অ্যামবাসাডরে গিয়ে উঠলেন। এবার তিনি নিজে স্টিয়ারিং ধরে বসলেন। পেছনে যারা দাঁড়িয়ে রইল তাদের, বিশেষ করে সোহিনী আর সুকুমারের দিকে ফিরেও তাকালেন না। সারাদিন হইহই করে এতখানি আনন্দ করার পর যাবার সময় দু'টি বিষাদগ্রস্ত, করুণ মুখ দেখতে ইচ্ছা করল না তাঁর।

আট

পিকনিক স্পট থেকে ফের দিবাকররা হাইওয়েতে চলে এসেছেন।

হেমন্তের সন্ধে নেমে গেছে ঝপ করে। আঁধারের ভরে যাচ্ছে চরাচর। দু'ধারের ধানখেত, গ্রাম, ছোটখাটো দু-একটা মফস্বল শহর সব ঝাপসা ঝাপসা, ঘষা কাচের ভেতর দিয়ে দেখলে যেমনটা চোখে পড়ে, প্রায় সেইরকম।

ঝাঁকে ঝাঁকে গাড়ি আসছে উলটো দিক থেকে। সাঁই সাঁই বেরিয়ে যাচ্ছে। দিবাকরদের পেছনেও লাইন দিয়ে গাড়ি।

সুকুমারের সঙ্গে যখন সোহিনীর ব্যাপারে কথা হচ্ছিল, মণিময় আর শুভেন্দু অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। ওঁদের কথাবার্তা কিছুই শুনতে পায় নি তারা। তবে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল ওদের।

গাড়িতে ওঠার পর মণিময়দের সব জানিয়ে দিয়েছেন দিবাকর। তাঁর মতো মণিময়েরও মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। তিনি এ নিয়ে কিছুই বলেননি। স্বপ্নভঙ্গটা শুধু সোহিনী, সুকুমার বা রেণুকারই হয়নি। যেন তাঁরও হয়েছে।

নিজেদের ফুরিয়ে আসা জীবনকে নিয়ে তিনজনে প্রায়ই হাসি ঠাট্টা মশকরায় মেতে ওঠেন। লঘু চালে উড়িয়ে দেন ঘনিয়ে-আসা মৃত্যুর যাবতীয় শঙ্কা বা আতঙ্ক। তাঁদের বেঁচে থাকার পরিধি মাত্র ছ'টি মাস। তারপর এই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে হবে। শেষের সেদিনের জন্য তাঁরা মনে মনে প্রস্তুত। কিন্তু শুভেন্দুর জন্য ভীষণ বিমর্ষ বোধ করছেন মণিময় আর দিবাকর। দু'জনেই কম দিন তো বাঁচেন নি। একজনের বয়স ষাটের ওপর, আর একজনও পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কত কিছুই তো দেখেছেন। সুখ আনন্দ তো ছিলই, নিদারুণ দুঃখ কষ্টও কম ভোগ করেন নি। বেঁচে থাকার লক্ষ কোটি অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে জীবনের শেষ পর্বে এসে পৌঁছেছেন। মৃত্যু হলে তাঁদের কোনও আক্ষেপ নেই। থাকবে না লেশমাত্র মনস্তাপ। কিন্তু শুভেন্দু? সাতাশ-আটাশ বছরের তরতাজা একটি যুবক, সবে জীবনের লম্বা দৌড় শুরু করেছিল। তার সামনে অফুরান

ভবিষ্যৎ। কিছুই সে পায়নি, অথচ কত কিছুই তো পেতে পারত। এতদিন এই দিকটা নিয়ে মণিময় আর দিবাকর সেভাবে ভাবেননি। কিন্তু সোহিনী, পরমাশ্চর্য সেই মেয়েটি এবং তার মা-বাবা তাকে নিয়ে যখন স্বপ্ন দেখতে শুরু করল তখনই হয়তো মনে হয়েছিল কেন এত তাড়াতাড়ি তার আয়ু ফুরিয়ে যাবে? সোহিনীকে নিয়ে সে তিরিশ চল্লিশটা বছর কাটিয়ে দিলে জগতের কার কি এমন ক্ষতি হত? সূর্য কি আলো দেওয়া বন্ধ করত? বাতাস কি বইত না? আহ্নিক গতি বার্ষিক গতি থেমে যেত?

দিবাকর এবং মণিময়কে বিষাদগ্রস্ত দেখে দারুণ মজাই লেগেছে শুভেন্দুর। হঠাৎ হো হো করে সশব্দে হেসে উঠেছে সে। হাসিটা যেন ভেতর থেকে উথলে আসছিল প্রবল তোড়ে।

ভুরু কুঁচকে দিবাকর শুভেন্দুর দিকে তাকিয়েছেন।—'এত হাসির কী হল?'

শুভেন্দু হাসতেই হাসতেই বলেছে, 'নিজেদের লাইফ নিয়ে সারাক্ষণ আপনাদের এত 'ফান', আর একটা মেয়ের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে মড়িয়ে কিনা 'মোরোস' হয়ে পড়লেন! আমাদের আয়ু তো আর ছ'মাস। ওই যে পুরনো কী একটা কথা আছে পদ্মপাতায় জল, আমরা তেমনি টলমল করছি। ফরগেট দ্যাট গার্ল।'

একটা তীব্র ঝাঁকুনি লেগেছিল দিবাকরের। লহমায় নিজস্ব মেজাজে ফিরে গেছেন তিনি।—'রাইট রাইট রাইট। যা পেছনে ফেলে এসেছি তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ঠিকই তো, সুকুমারবাবুকেও তোমাদের ঠিকানা, ফোন নাম্বার টাম্বার কিছুই দিয়ে আসি নি। কিন্তু হাইওয়েতে আসার পর সোহিনীর কথা ভেবে মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। নো নো, পেছনে দিকে তাকানোর আর দরকার নেই। লেট'স মুভ ফরোয়ার্ড—'

এরপর সোহিনীদের নিয়ে কেউ আর একটি শব্দও মুখে আনেননি।

হাইওয়ের দু'ধারে অনেকটা পর পর ল্যাম্পপোস্ট। জোরালো আলো তেলতেলে পিচের রাস্তার চমকানি বাড়িয়ে তুলেছে। সামনের দিক থেকে ছুটে আসছে ট্রাক বাস মিনিবাস অটো প্রাইভেট কাব। সেগুলোর হেডলাইট থেকে আলোর ঝলক ঠিকরে পড়ছে চারিদিকে।

স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন দিবাকর। কাল রাতে ঠাকুরবাবার মেলায় সারা রাত যাত্রা শুনেছেন, এক ফোঁটাও ঘুম হয়নি। সকাল থেকে শুরু হয়েছিল দৌড়। পথে পিকনিক পার্টির সঙ্গে দেখা, তাদের সঙ্গে সমস্ত দিন হুল্লোড়বাজি করে কেটেছে। বিকেল হলে ফের বেরিয়ে পড়েছেন তাঁরা, ফের দৌড়। এখন রীতিমতো ক্লান্তি বোধ করছেন; চোখ বুজে আসতে চাইছে। হাইওয়েতে চোখ-বোজা মানে মহা সর্বনাশ। অ্যাকসিডেন্ট অবধারিত। তাই চোখ এবং স্নায়ু টান টান করে মাঝামাঝি স্পিডে ড্রাইভ করছেন দিবাকর।

দিবাকরেরই শুধু নয়, শরীর ভেঙে আসছিল মণিময় এবং শুভেন্দুরও। মণিময় বললেন, 'দাদা, নার্ভগুলো ছিঁড়ে পড়ছে। এখন কোথাও শুয়ে পড়তে না পারলে স্রেফ মারা পড়ব।'

শুভেন্দুও তাঁর কথায় সায় দিল।

দিবাকর বললেন, 'একটু নজর রেখো, কোনও ধাবা টাবা পাওয়া যায় কিনা। কিংবা কোনও পেট্রোল পাম্প টাম্প। ওরা অনেকেই রাতে থাকার জন্যে ঘর টর ভাড়া দেয়। হাইওয়েতে এ ছাড়া—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই করুণ, আর্ত চিৎকার ভেসে এল। কোনও মেয়ের কণ্ঠস্বর। বুক চিরে যেন আওয়াজটা বেরিয়ে আসছে—'বাঁচাও, বাঁচাও—'

ট্রাক বাস এবং অন্য সব গাড়ির লোকজন হঠাৎ তুমুল হইচই জুড়ে দিল। এত মানুষ একসঙ্গে গলার শির ছিঁড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী বলছে তার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটুকু টের পাওয়া যাচ্ছে সবাই ভীষণ উত্তেজিত এবং ত্রস্তও।

এদিকে দু'পাশের গাড়িগুলো দৌড়তে দৌড়তে আচমকা ব্রেক কষে কষে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। ফলে গাড়িগুলোর মধ্যে ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছে। দিবাকরদের অ্যামবাসাডরটার পেছনে একটা টাটা সুমো আসছিল। সেটার ড্রাইভার যাতে মারাত্মক অ্যাকসিডেন্ট না ঘটে তাই সুমোটার সামনের দিকটা বাঁ ধারে যতটা সম্ভব ঘুরিয়ে প্রাণপণে ব্রেক কষেছিল, তবু দিবাকরদের গাড়িটার পেছনে ধাক্কা লেগে গেল, তবে সেটা তেমন জোরালো কিছু নয়।

সব আওয়াজ ছাপিয়ে সেই ভয়ার্ত চিৎকারটা আরও তীব্র হয়ে উঠছে। সেটা যেন দিবাকরদের দিকেই এগিয়ে আসছে। কণ্ঠস্বরটা যে কোনও মেয়ের তা আগেই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মেয়েটাকে দেখতে পেলেন না দিবাকররা।

শুভেন্দু জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার বলুন তো দিবাকরদা?'

দিবাকর বললেন, 'তুমিও যেখানে আমিও ঠিক সেইখানে। কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না—'

মণিময় কিছুই বলছিলেন না, জানালার বাইরে বুক অব্দি বার করে দেখছিলেন। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওই যে আসছে। দিবাকরদা, মনে হচ্ছে সেই মেয়েটা—' তাঁর চোখে মুখে এবং কণ্ঠস্বরে প্রবল উত্তেজনা।

'কোন মেয়েটা? কোন মেয়েটা?' বলতে বলতে দিবাকর এবং শুভেন্দুও জানালার বাইরে ঝুঁকল।

হাইওয়ের দু'ধারে ট্রাক বাস এবং অন্য সব যানবাহন দাঁড়িয়ে পড়েছিল আগেই। মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখান দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে সেই যুবতীটি। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তার লাল শাড়ির আঁচল রাস্তায় লুটোচ্ছে, রুক্ষ চুল উড়ছে বাতাসে। চেহারা পুরোপুরি বিধ্বস্ত। বোঝাই যায় সে আর পারছে না, হাত-পা ভেঙে আসছে, তবু লহমার জন্যও থামছে না। দৌড়চ্ছেই, দৌড়চ্ছেই। অবিরাম দৌড়েই চলেছে।

দিবাকর হতচকিত। কাল মেয়েটাকে ঠাকুরবাবার মেলায় প্রথম দেখেছিলেন। তারপর হাইওয়ের লেভেল ক্রসিংয়ের সামনের রেল লাইনে। আজ সন্ধের পর ফের তাকে দেখা গেল। কাল থেকেই মেয়েটা প্রাণভয়ে এভাবে দৌড়চ্ছে নাকি? মারাত্মক বিপদে যে সে পড়েছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কীসের বিপদ?

মস্তিষ্কে ভাবনার ক্রিয়াটা যে চলছিল হঠাৎই সেটা থমকে গেল। দিবাকরের চোখে পড়ল সেই হিংস্র চিতার দঙ্গলটা মেয়েটাকে ধাওয়া করে আসছে। তাদের হাতে সেই সব অস্ত্রশস্ত্র—লাঠি, বল্লম, দা। মেলায় এবং রেল লাইনে কয়েকজনকে দৌড়তে দেখা গিয়েছিল। এখন তাদের সঙ্গে রয়েছে দু'টো মোটর বাইকে আরও চারজন। তাদের একজনের হাতে বন্দুক। তবে যানবাহনের জটলা ভেদ করে বাইক দু'টো ঠিকমতো এগুতে

পারছে না। মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ছে, তারপর ফাঁকফোকর বার করে ধেয়ে আসতে চেষ্টা করছে।

নতুন করে চিন্তার প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে গেল দিবাকরের। মেয়েটার ওপর এই লোকগুলোর এত আক্রোশ কেন? কী মতলব তাদের? মেয়েটাকে খুন করা?

আশ্চর্য, লরি বাস টাস থেকে লোকজন সামনে চেঁচাচ্ছে কিন্তু কেউ নেমে যে মেয়েটাকে বাঁচাবে তার লেশমাত্র ইচ্ছা বা সাহস কোনওটাই তাদের নেই। মানুষ আজকাল মেরুদণ্ডহীন কেঁচো হয়ে গেছে। সারি সারি নপুংসকের দল।

যে দুঃসাহসী সামরিক অফিসার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দু'দু'টো মরণপণ অভিযান চালিয়েছিল, একটা বড় রকমের জটিল অপারেশন আর একটা কেমো নেবার পর তার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন দিবাকর। কিন্তু এই মুহূর্তে খেয়াল হল সেই ভয়লেশহীন কর্নেল মরে যায় নি। তাঁর মধ্যেই এখনও রয়ে গেছে। রক্তের ভেতর থেকে সে যেন প্রবল পরাক্রমে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

দিবাকর ব্যগ্রভাবে বললেন, 'মেয়েটার জন্যে আমাদের কিছু একটা করতেই হবে।'

মণিময় জিগ্যেস করলেন, 'কী করতে চান?'

'আপাতত ওকে রক্ষা করা। পরে ওর সঙ্গে কথা বলে নেক্সট স্টেপ ঠিক করব।'

মেয়েটা সেইরকম চিৎকার করতে করতে কাছাকাছি চলে এসেছিল। অবিরল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তার গলা চিরে গেছে। কাছে আসায় হাইওয়ের ল্যাম্পপোস্ট আর নানা গাড়ির আলোয় তাকে এখন আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মেয়েটা বেশ সুন্দরী। কিন্তু তার ওপর দিয়ে ক'দিন ধরে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, কে জানে। হয়তো তিন চার দিন সে ঘুমোয় নি। ফলে চোখের কোলে গাঢ় কালির ছোপ। হয়তো খাওয়াও জোটেনি। নির্জীব হয়ে এসেছে শরীর। পরনের শাড়িটা নতুন কিন্তু নানা জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, খালি পায়ে রক্ত জমে আছে। এক পাল জন্তুর হাত থেকে বাঁচার জন্য শেষ শক্তিটুকু জড়ো করে সে ছুটেই চলেছে। কিন্তু এক দঙ্গল শিকারি চিতার নাগালের বাইরে কতক্ষণ থাকতে পারবে? ধরা তাকে পড়তেই হবে।

দিবাকর বললেন, 'মণিময়, তুমি ব্যাক-সিটে চলে যাও। ডান ধারের দরজাটা খোলা রেখো।' বলেই লোহার মুঠ-লাগানো মজবুত বেতের লাঠিটা হাতে নিয়ে নেমে পড়লেন।

মেয়েটা ততক্ষণে দিবাকরের প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়েছে। লহমায় তাঁর একটা হাত ধরে অ্যামবাসাডরের ব্যাক-সিটে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, 'কোনও ভয় নেই মা। আমরা আছি, ওই জানোয়ারগুলো তোমার এতটুকু ক্ষতি করতে পারবে না।'

কথামতো দরজা খুলে রেখেছিলেন মণিময়। মেয়েটি ভেতরে ঢুকতেই দিবাকর তাঁকে বললেন, 'জানালার কাচ তুলে দরজা লক করে দাও—'

কিন্তু তিনি নিজে যে গাড়িতে উঠে পড়বেন সেই সময়টা আর পাওয়া গেল না। সেই ঘাতক বাহিনী ইতিমধ্যে কাছে এসে পড়েছে। তাদের একজন কর্কশ গলায় গর্জে ওঠে, 'মেয়েটারে গাড়িটায় তুললেন কেন? লাবিয়ে দেন—' তার চোখ টকটকে লাল। ছড়ানো চোয়াল। পুরু পুরু কালো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ট্যারাবাঁকা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। দেখামাত্র টের পাওয়া যায় খুন করাটা ওর কাছে জলভাত।

দিবাকর রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। বললেন, 'বাস্টার্ড, তোর কথায় নামিয়ে দেব? কাল থেকে দেখছি ওর পেছনে লেগে আছিস। এক্ষুনি এখান থেকে সরে পড়। না হলে—'

তাঁর কথা শেষ হতে না-হতেই খুনে টাইপের লোকটা হুমকির সুরে বলে ওঠে, 'শুয়ারকা বাচ্চা, তোকে জানে খতম করে ফেলব।' হাতে শাবলের মতো লোহার একটা ডাণ্ডা ছিল। সেটা তুলে দিবাকরের মাথা তাক করে সজোরে নামিয়ে দেয়।

দিবাকর গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে চকিতে মাথা সরিয়ে নিয়ে হাতের ছড়িটা অব্যর্থ লক্ষ্যে চালিয়ে দিলেন। ছড়ির লোহার মুঠটা সপাটে গিয়ে আছড়ে পড়ে লোকটার কপালে। চড়াৎ করে খুলিটা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে থাকে। সে ঠিকরে পড়ে দশ পনেরো ফিট দূরে। রক্তে মাখামাখি হয়ে যায় সারা শরীর। তার গলার ভেতর থেকে 'আঁক' করে একটা আওয়াজ বেরোয় শুধু। তারপর একেবারে নিথর হয়ে যায়।

দিবাকরের অনুমানশক্তি প্রখর। তিনি বুঝতে পারছিলেন খুনেটার যে

তিন সঙ্গী রয়েছে তারা তাঁকে ছাড়বে না। ওদের কোনও সুযোগ দেওয়া মানেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা। লোকটার হাল দেখে ওরা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রীতিমতো হতভম্ব। একটা বয়স্ক লোক যে এভাবে শুধু বেতের লাঠি দিয়ে ঘায়েল করতে পারে ভাবতে পারেনি। ওদের সামলে ওঠার, আগেই ফের দু'বার সপাটে ছড়ি চালালেন দিবাকর। প্রথম লোকটার মতো আরও দু'জন ধরাশায়ী হল। বাকি যে ছিল সে দাঁড়িয়ে থাকা বুদ্ধিমানের কার্জ মনে করে না, চোখের পলকে গাড়িটাড়ির ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে লহমায় উধাও হয়ে যায়।

বাইকে যারা আসছিল তারা কিন্তু হাল ছাড়েনি। কিন্তু ট্রাক বাস টাসের বেড়াজাল ভেদ করে তাদের পক্ষে দ্রুত এগুনো সম্ভব হচ্ছিল না। দূর থেকে দিবাকরের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে তোড়ে কুৎসিত কুৎসিত খিস্তি দিয়ে যাচ্ছিল।

দু'পাশের গাড়িগুলোতে যারা রয়েছে তারা যেমন উত্তেজিত তেমনি খুশি। লোকগুলো গলার স্বর শেষ পর্দায় তুলে তুমুল হট্টগোল বাধিয়ে দিয়েছে।

'সাব, বহুৎ আচ্ছা কিয়া—', 'শয়তানের বাচ্চাগুলোকে আপনি ঢিট না করলে মেয়েটার সর্বনাশ হয়ে যেত—' 'আপনার জবাব নেই স্যার—' ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজেদের সাহসে কুলোয়নি, তেমন বুকের পাটা নেই, তবে একজন রুখে দাঁড়িয়ে বদমাশদের শায়েস্তা করেছে, সেজন্য কোরাসে বাহবা জানাতে আপত্তি নেই।

দিবাকর আর দাঁড়ালেন না। বাইকওলাদের হাতে বন্দুক আছে। তারা এসে পড়লে নির্ঘাত গুলি চালিয়ে দেবে। তিনি নিজেদের গাড়িতে ফিরে এসে ব্যাক-সিটে বসলেন। মণিময়কে বললেন, 'তুমি ড্রাইভ কর। যেমন করে পার, গাড়ির জটলা থেকে আমাদের অ্যামবাসাডরটা বার করে রাস্তার ধারে যে ঘাসের ঢালু জমি আছে সেখানে নিয়ে যাও। তারপর পাশ দিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাও। নিচের ক্যানালে পড়ে যাবার রিস্ক কিন্তু আছে। সেটা নিতেই হবে।'

মণিময় তুখোড় ড্রাইভার। কথামতো খুব অল্প জায়গার মধ্যে গাড়িটাকে আগু-পিছু এবং কাত করতে করতে ঘাসের গড়ানে জমিতে নিয়ে গেলেন।

তারপর খুব সাবধানে চালাতে লাগলেন। সামান্য এদিকে ওদিক হয়ে গেলে অধঃপতন অনিবার্য। গাড়ি সোজা খালের জলে গিয়ে পড়বে।

পেছনের সিটে সেই মেয়েটি সিঁটিয়ে রয়েছে। ঘাতক বাহিনী যখন তাকে ধাওয়া করছিল ভয়ে আতঙ্কে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছিল সে। সেই আতঙ্কটা এখন শতগুণ বেড়ে গেছে। কারণটা আন্দাজ করতে পারছিলেন দিবাকর। যারা তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলেছে তাদের চেহারা, পোশাক আশাক ভদ্রলোকের মতো। কিন্তু বাইরেটা দেখে মানুষকে কতটা চেনা যায়? এরা যে মানুষ ভাল, এদের যে কোনও মারাত্মক দুরভিসন্ধি নেই, কে তা বলবে? বহু ভদ্রলোকের নানা নোংরা কীর্তিকলাপের কথা হয়তো তার জানা। কে জানে চিতাদের খপ্পর থেকে আরও হিংস্র কোনও জন্তুর মুখে এসে পড়ল কিনা।

মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা রেখে একটু দূরে বসে আছেন দিবাকর। কয়েক লহমা মেয়েটাকে লক্ষ করলেন। রুক্ষ তেলহীন চুল কপালে গালে লেপ্টে আছে। চোখের তলায় কালির পোঁচ। সারা শরীরে ধুলোর প্রলেপ। অসীম ক্লান্তিতে সে ধুঁকছে।

মেয়েটির পরনে যে লাল শাড়িটা আগে চোখে পড়েছিল, এখন দেখা গেল সেটা নতুন বেনারসি। কিন্তু দু'দিন অবিরাম দৌড়ের কারণে ময়লা এবং লাট হয়ে গেছে। মেয়েটির হাতে সোনার চুড়ি, গলায় হার, কানে দুল, আঙুলে আংটি, ইত্যাদি। গয়নাগুলো সবই নতুন। পা অবশ্য খালি। আগে কি জুতো দেখেছিলেন? মনে পড়ল না। প্রথম দিন ঠাকুরবাবার মেলায় খোঁপায় ফুলের বেড় চোখে পড়েছিল। এখন একটা পাপড়িও নেই।

বেনারসি, গয়না, ফুলের সাজ—চকিতে দিবাকরের মনে হল, মেয়েটি কি বিয়ের কনে? সম্ভব, খুবই সম্ভব। কিন্তু সে এভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন?

দিবাকর খুব নরম গলায় বললেন, 'তোমার কোনও ভয় নেই মা—'

বয়স্ক মানুষটির কণ্ঠস্বরে এমন এক মায়া মাখানো যে মেয়েটির আতঙ্ক কিছুটা হলেও যেন কাটে। তা ছাড়া 'মা' ডাকটা তাকে একটু যেন ভরসাই দেয়। তবু অবিশ্বাস পুরোপুরি ঘোচে না। সে চুপ করে থাকে।

দিবাকর জিগ্যেস করেন, 'তোমার নাম কী?' তাঁর গলা আগের মতোই আর্দ্র। স্নেহ মাখানো।

এবারও মেয়েটি নীরব।

দিবাকর তার দিকে সামান্য ঝুঁকলেন।—'আমি তোমার বাবার বয়েসী। কি তার চেয়েও বড়। তোমার এতটুকু ক্ষতি করব না। নামটা বল মা—'

মেয়েটির মধ্যে যে দ্বিধার ভাবটা ছিল তা ধীরে ধীরে মুছে যায়। হয়তো সে ভাবে, এই লোকটি হিংস্র চিতাগুলোর মুখ থেকে তাকে উদ্ধার করেছে। শুধু তাই না, দু'টো জন্তুকে মেরে রক্তাক্ত, বেহুঁশ করে দিয়েছে। এ না বাঁচালে রেহাই ছিল না। সশস্ত্র বাহিনীটা দু'দিন ধরে তাকে তাড়া করে চলেছে। সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আর পারা যাচ্ছিল না। শরীরের সব শক্তি তার ফুরিয়ে এসেছে। আজ ওরা তাকে নির্ঘাত ধরে ফেলত। তারপর কী ঘটত ভাবতে সাহস হয় না।

বয়স হলেও তার কাছাকাছি বসে থাকা মানুষটি অসীম সাহসী এবং বিপুল শক্তির অধিকারী। মেয়েটি ভাবে তার এই রক্ষাকর্তাকে বিশ্বাস করা যায়। সে ছাড়া অন্য কেউ তাকে এই দু'দিন বাঁচাতে আসেনি। কাঁপা কাঁপা, জড়ানো গলায় বলল, 'আমার নাম কমলা।'

দিবাকর বললেন, 'কাল থেকে তিন জায়গায় তোমাকে দেখেছি। খালি ছুটছ আর ছুটছ।'

'দেখতেই তো পেয়েছেন, আমি পালাচ্ছিলাম।'

'কোথায়?'

'তা জানি না।'

মেয়েটি অর্থাৎ কমলার বলার ভঙ্গিতে একটা মফস্বলি টান রয়েছে। তবু বাংলাটা তার পরিষ্কার, ঝরঝরে। মনে হয়, খানিকটা লেখাপড়া শিখেছে। জিগ্যেস করলেন, 'ওই শয়তানগুলো কারা?'

ঘৃণায় চোখ কুঁচকে গেল কমলার।—'জানোয়ারের দল। গুণ্ডা, বদমাশ, খুনে এক-একটা।'

'ওরা তোমাকে তাড়া করছিল কেন?'

'নিশাপতি দাস আমার পেছনে ওদের লেলিয়ে দিয়েছে।'

'নিশাপতি দাস কে?'

'আমার দূর সম্পর্কের কাকা।'

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন দিবাকর। সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। জিগ্যেস করলেন, 'কাকা হয়ে তোমার পেছনে গুণ্ডা লাগাবে কেন? আমাকে সব কিছু খুলে বল!'

আগেকার আতঙ্ক আর অবিশ্বাস কেটে গিয়ে কমলা অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে আসছে। সে ধীরে ধীরে যা বলল তা মোটামুটি এইরকম।

ঠাকুরবাবার মেলাটা যেখানে বসে সেখান থেকে সাত আট কিলোমিটার দূরে বেগমপুর এক নগণ্য মফস্বল টাউন। এই শহরে কমলাদের বাড়ি।

খুব অল্প বয়সে মাকে হারিয়েছে সে। ভাইবোন নেই। থাকার মধ্যে একজনই। তার বাবা ধনঞ্জয় হাজরা। সে-ই দু'হাতে মেয়েকে আগলে আগলে রেখে খুব যত্নে বড় করে তুলেছে। পৃথিবী তো দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার ক্লেদ বা আঁচ মেয়ের গায়ে কখনও লাগতে দেয় নি ধনঞ্জয়।

ছোট শহর হলেও বেগমপুরে একটা মিউনিসিপ্যালিটি আছে। সেখানে সামান্য কাজ করত সে। কাঁচা নর্দমায় মশামারা তেল ছিটনো আর ঝাড়ুদারদের কাজের তদারকি, এই ছিল তার ডিউটি। তুচ্ছ মফস্বল টাউনের টাকা পয়সার জোর আর কতটুকু! কী-ই বা মাইনে পেত ধনঞ্জয়। কিন্তু জমিজমা ছিল। চাষবাস করে তার থেকে ভালই টাকা হত। মাইনে আর জমির আয়ে হেসে খেলে চলে যেত দু'জনের।

ধনঞ্জয়ের লেখাপড়ার দৌড় বেশি দূর নয়। প্রাইমারি স্কুলে বছর তিনেক যাতায়াত করেছে মাত্র। তারপরেই ওই পর্বের ইতি। নিজের বিদ্যেটিদ্যে যেমনই হোক আর মিউনিসিপ্যালিটিতে যত ছোটখাটো কাজই করুক, মেয়েকে নিয়ে তার ছিল বিশাল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কমলা যত দূর পড়তে চায়—বি. এ, এম. এ—তাকে তাই পড়াবে। পয়সাওলা, শিক্ষিত পরিবারে বিয়ে দেবে। ছেলে এম. এ পাশ না হলে চলবে না। তার বড় চাকরি করা চাই। সেজন্য টাকাও জমাচ্ছিল সে, একটা দু'টো করে গয়নাও তৈরি করাচ্ছিল।

মিউনিসিপ্যালিটিতে তার মতো ক্লাস ফোর স্টাফের সে-সব এমপ্লয়ি কাজ করে তাদের বেশির ভাগই মদে ডুবে থাকে। কিন্তু ধনঞ্জয় নেশাভাঙের ধারেকাছে থাকত না, অন্য কোনও রকম বদখেয়ালও ছিল না তার। মেয়েই ছিল একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বপ্ন পূরণ হল না ধনঞ্জয়ের। জীবনটা মসৃণ গতিতে চলছিল। আচমকা জোর ধাক্কা খেয়ে মুখ গুঁজড়ে পড়ল। সাতদিনের জ্বরে দুম করে মারা গেল ধনঞ্জয়। মিউনিসিপ্যালিটির যে ডাক্তার তাকে দেখেছিল সে রোগটা ধরতে পারেনি। আন্দাজে কাঁড়ি কাঁড়ি ট্যাবলেট খাইয়ে গেছে। তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

মৃত্যুর ক'দিন আগেই ধনঞ্জয় টের পাচ্ছিল, সময় শেষ হয়ে আসছে। সে চোখ বুজলে কমলার কী হবে? জ্বরের মধ্যেই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল সে।

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-পরিজন তেমন কেউ ছিল না ধনঞ্জয়ের। একটামাত্র বোন ছিল, তার শ্বশুরবাড়ি মেদিনীপুরে কিন্তু সে-ও মরে গেছে। কমলা সেবার হায়ার সেকেন্ডারি দেবে। সুন্দরী, যুবতী। ধনঞ্জয় মারা গেলে একেবারে একা হয়ে যাবে কমলা। তার মাথার ওপর কেউ থাকবে না। একটি যুবতীর পক্ষে একা একা থাকা যে কতটা বিপজ্জনক ভাবতেই জ্বরের ঘোরেও শিউরে উঠেছে ধনঞ্জয়। শিয়ালে শকুনে তাকে ছিঁড়ে খাবে।

কী করবে যখন ভেবে ভেবে তলকূল পাচ্ছে না, তখন হঠাৎই নিশাপতির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল ধনঞ্জয়ের। নিশাপতি দাস লতায় পাতায় তার মামাতো ভাই। বেগমপুরেই থাকত সে। ধানচালের কারবার তার, জমির দালালিও করে। শহরে খুব একটা সুনাম নেই। জাল দলিল করে এর জমি তাকে, তার জমি একে বেচার ব্যবস্থা করে। লোকে বলে জালি লোক। তবে মুখ ভারি মিষ্টি। কথা শুনলে মনে হয় মধুর কলস উপুড় করে ঢেলে দিচ্ছে।

নিশাপতির সঙ্গে মাখামাখি তো দূরের কথা, এর বাড়িতে ওর কিংবা ওর বাড়িতে এর আসা-যাওয়া ছিল না। তবে ছোট শহর, পথে বেরুলে প্রায়ই দেখা হয়। নিশাপতি হেসে হেসে দু-একটা কথা বলে। কমলার খবর নেয়। ধনঞ্জয়ও তাই। নিশাপতির কারবার কেমন চলছে, বাড়িতে কে কেমন আছে, এমনি নানা প্রশ্ন করে।

নিশাপতির ছেলেপুলে নেই। স্ত্রীর নাম রাধিকা। সে বাঁজা এবং শান্ত প্রকৃতির। নিরীহ ভালমানুষ বলতে যা বোঝা যায় তাই। আর আছে নিশাপতির বিধবা, মাঝবয়সী এক পিসি মহামায়া। বিয়ের চার বছরের

মাথায় স্বামীর মৃত্যু হয়। ছেলেমেয়ে হয়নি। নিশাপতির বাবা উমাপতি তখনও বেঁচে। সে মেয়েকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে নিজের কাছে নিয়ে আসে। উমাপতি মারা গেলে সে নিশাপতির সংসারেই থেকে যায়।

এতটা বয়স হলেও শরীরের বাঁধুনি বেশ মজবুত মহামায়ার। শক্তপোক্ত, কেজো চেহারা। সারাদিন ভূতের মতো খাটে আর চেঁচিয়ে মেচিয়ে বাড়ি মাত করে রাখে। যতই চিৎকার করুক, মানুষটা খাঁটি। তার মধ্যে লেশমাত্র কুচুটেপনা কি নোংরামি নেই।

নিশাপতির কথা ভাবতে গিয়ে মহামায়া আর রাধিকার কথাও মনে পড়ে গিয়েছিল ধনঞ্জয়ের। তার মৃত্যু হলে কমলা তো আর একা এ বাড়িতে থাকতে পারবে না। তাকে গিয়ে থাকতে হবে নিশাপতিদের কাছে। সেখানে রয়েছে মহামায়া আর রাধিকা। এই দু'জন বড় ভরসা। মেয়েটাকে তারা নিশ্চয়ই আগলে রাখবে।

জমি টমি নিয়ে ফেরেববাজির যত বদনামই থাক, কমলা যত দূর সম্পর্কেরই হোক, তার ভাইঝি। ভাইঝি আর মেয়েতে তফাত কতটুকু? মৃত্যুশয্যায় শুয়ে খানিকটা হলেও দুর্ভাবনা কেটে গিয়েছিল ধনঞ্জয়ের। মেয়েটা নিশাপতিদের বাড়িতে নিরাপদেই থাকবে। তার কোনও ক্ষতি হবে না।

শেষ পর্যন্ত নিশাপতিকে খবর দিয়ে আনিয়ে কাছে বসিয়ে তার একটা হাত ধরে ব্যাকুলভাবে বলেছিল, 'নিশা, আমার সময় হয়ে এসেছে। আমি চোখ বুজলে কমলাকে তুই দেখিস। তোদের কাছে নিয়ে যাস। তুই ওর মাথার ওপর থাকলে নিশ্চিন্তে মরতে পারি।' একটু থেমে ফের বলেছে, 'ওর জন্যে তোর কোনও খরচ নেই। ভাগে আমার চাষের জমিগুলো দিয়ে রেখেছি। যা ফসল পাওয়া যায় ওর পক্ষে তা ঢের। তা ছাড়া ওর বিয়ের জন্যে গয়নাগাটি গড়িয়ে রেখেছি। টাকাপয়সাও কিছু জমানো আছে। সব তোকে দিয়ে যাব। যত তাড়াতাড়ি পারিস ওর বিয়েটা দিয়ে দিস। ভেবেছিলাম বি.এ, এম.এ পাশ করাব, তা আর হবে না। সবই ভাগ্য।—কি রে, আমার কথাটা রাখবি তো?'

এই কারণে তার ডাক পড়েছে, ভাবতে পারেনি নিশাপতি। প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল সে। তারপর ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।—'তুমি ভেবো

না দাদা। আমার বাড়ির হাল তো জানো, ছেলেমেয়ে নেই। ও আমাদের মেয়ে হয়েই থাকবে। আর ও যদি আরও পড়তে চায়, পড়াব। তারপর ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দেব। স্বর্গ থেকে তুমি দেখতে পাবে মেয়ে তোমার সুখে আছে।'

এরপর অপার শান্তিতে পৃথিবীর সঙ্গে ছাপ্পান্ন বছরের যাবতীয় সম্পর্কের গিঁট ছিঁড়ে ধনঞ্জয় চিরকালের মতো চোখ বোজে।

তার মৃত্যুর পর কমলার মনে হয়েছিল চারিদিক ফাঁকা হয়ে গেছে। খেতো না, ঘুমতো না। ক'টা দিন অঝোরে কেঁদে গিয়েছিল সে। এই চরম দুঃসময়ে তাকে ঘিরে রেখেছিল রাধিকা, মহামায়া আর নিশাপতি। মহামায়া দিন রাত তার কাছে থাকত। রাধিকা আর নিশাপতি দু'বেলা এসে অনেকটা সময় থেকে যেত। বোঝাত, বাপ-মা চিরদিন থাকে না, এটা জগতের নিয়ম, ইত্যাদি। বহুকালের পুরনো সেই সব সান্ত্বনার বাণী। শোকের দিনে ধনঞ্জয়দের একান্ত আপনজন মনে হয়েছিল কমলার।

শ্রাদ্ধ ট্রাদ্ধ নিজেদের বাড়িতেই হয়েছিল। তারও সপ্তাখানেক বাদে ভারি নরম গলায় নিশাপতি বলেছে, 'কমলা, এবার তো ও বাড়িতে যেতে হবে। পিসির ওখানে অনেক কাজ। সেসব ফেলে এখানে দিনের পর দিন থাকা তো সম্ভব নয়। ধনঞ্জয়দা তোকে আমাদের কাছে নিয়ে যেতে বলেছে। তক্তপোশ টোশগুলো এখানেই থাক। দামি জিনিস, তোর বই, জামাকাপড়, বাসন কোসন, বাড়ির দলিলপত্র—সব নিয়ে যেতে হবে। ধনঞ্জয়দা অবশ্য তোর বিয়ের গয়না, টাকাপয়সা আমাকে আগেই দিয়ে গেছে। কাল তাহলে একটা ভ্যান নিয়ে আসি?'

আস্তে মাথা নেড়েছিল কমলা।—'আচ্ছা।' তার দু'চোখ জলে ভরে যাচ্ছিল।

তার মাথায় হাত রেখে নিশাপতি আর্দ্র স্বরে বলেছে, 'জানি তোর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এছাড়া উপায়ও তো নেই। এখন তো তোর দু'টো বাড়ি। এটা তো রইলই, যেখানে যাবি সেটাও। কি রে, ও বাড়িটাকে নিজের করে নিতে পারবি না?'

কাঁপা কাঁপা, ঝাপসা গলায় কমলা বলেছে, 'পারব।'

পরদিন একটা তিন চাকাওলা ভ্যান আর দু'টো সাইকেল রিকশা নিয়ে এসেছিল নিশাপতি। তখন পশ্চিমের উঁচু উঁচু গাছপালার আড়ালে সূর্যটা

নেমে যাচ্ছে। রোদের রং ম্যাড়মেড়ে। মনে আছে সেটা ফাল্গুন মাস। সন্ধে নামতে খুব বেশি দেরি নেই।

মহামায়া আর কমলা মালপত্র আগেই গোছগাছ করে রেখেছিল। ভ্যানের ড্রাইভারকে দিয়ে সেসব ভ্যানে তোলাল নিশাপতি। তারপর বাড়ির প্রত্যেকটা ঘরে তালা লাগিয়ে চাবির থোকাটা কমলার হাতে দিয়ে বলল, 'গাড়িতে উঠে পড়—'

একটা রিকশায় উঠেছে নিশাপতি। অন্যটায় মহামায়া আর কমলা।

একসময় গাড়িগুলো চলতে শুরু করে। সবার আগে রয়েছে নিশাপতির রিকশা। সে-ই যেন পথ প্রদর্শক। রাস্তা দেখাতে দেখাতে নিয়ে চলেছে। তার পেছনে কমলাদের রিকশা। একেবারে শেষে ভ্যানটা।

সন্ধে নেমে গিয়েছিল। জোলো কালির মতো ফিকে অন্ধকারে ভরে যাচ্ছে চারিদিক। রাস্তার দু'ধারের বাড়িগুলোতে আলো জ্বলে উঠেছে। তবে মিউনিসিপ্যালিটির যে ল্যাম্পপোস্টগুলোতে যেসব টিমটিমে বাল্ব রাতভর আলো দেয় সেগুলো জ্বলে উঠতে তখনও দেড়-দু'ঘণ্টা দেরি।

পেছন ফিরে বার বার নিজেদের বাড়িটার দিকে তাকাচ্ছিল কমলা। রিকশা যত সামনের দিকে এগুচ্ছে, বাড়িটা তত পিছিয়ে পড়ছে। বাবা নেই, নিজেদের বাড়িতেও আর কখনও থাকা হবে কি না, কে জানে। একটা কান্না বুকের ভেতর থেকে উঠে এসে গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছিল তার। কী কষ্ট যে হচ্ছিল!

পলকহীন কমলাকে লক্ষ করছিল মহামায়া। প্রথম দিন থেকেই এই মেয়েটার প্রতি অপার সহানুভূতি আর মায়ায় ভরে আছে তার মন। কমলার কষ্টটা সে টের পাচ্ছিল। এক হাতে মেয়েটার পিঠ বেড় দিয়ে ধরে নরম গলায় বলেছে, 'তোকে মাঝে মাঝে এখানে এনে তোদের বাড়িটা দেখিয়ে নিয়ে যাব, কেমন?'

মাথাটা সামান্য হেলিয়ে দিয়েছে কমলা।—'আচ্ছা—'

তাদের বাড়িটা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ বাদে রিকশা যখন একটা বাঁক ঘুরে ডান দিকের জন্য একটা রাস্তায় এসে পড়ল, বাড়িটা আর দেখা গেল না।

বেগমপুরের এক মাথায় কমলাদের বাড়ি, আর এক-মাথায় নিশাপতিদের সেকেলে একতলা পাকা দালান। সামনের দিকে বাঁধানো

উঠোন। মোট তিনখানা শোবার ঘর। প্রতিটি ঘরে খাট আলমারি এবং অন্য যেসব আসবাব রয়েছে সেগুলো পুরনো ধাঁচের হলেও বেশ দামি দামি। বোঝাই যায়, নিশাপতি বেশ পয়সাওলা লোক।

কমলাদের পৌঁছতে সেখানে একটু রাতই হয়ে গেল। বাড়ির সামনের দিকের বারান্দায় বসে অপেক্ষা করছিল রাধিকা। রিকশা থেকে কমলা নামতেই দৌড়ে এসে তাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে একটা ঘরে নিয়ে গেল।

একটু যে দুশ্চিন্তা কমলার ছিল না তা নয়। তার পেছনে রয়েছে নিশাপতির বিশ্বজোড়া দুর্নাম। সে ঠগ, ফেরেববাজ, ধুরন্ধর। হাসতে হাসতে লোককে পথে বসিয়ে দেয়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তার কথায়বার্তায় আচরণে এমন কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি যা থেকে মনে হয় নিশাপতি তার এতটুকু ক্ষতি করতে পারে। বরং তাকে একজন সহৃদয়, স্নেহময় মানুষ মনে হয়েছিল। সবচেয়ে তাকে নাড়া দিয়েছিল মহামায়া। কী অফুরান মায়ায় যে এই মাঝবয়সী স্ত্রীলোকটি মাত্র কয়েকটা দিনে নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়েছে! এ বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে রাধিকাও যেভাবে ঘরে নিয়ে গেছে তাকে তাতে যে সংশয়টুকু ফেনার মতো মনের কোণে ভাসছিল তাও লাহমায় মুছে গেছে।

মাসদেড়েক বেশ ভালই কাটল। মহামায়ার নজর সারাক্ষণ তার ওপর। মা-পাখি যেভাবে দুই ডানার তার বাচ্চাকে ঘিরে রাখে হুবহু সেইভাবে কমলাকে আগলে রেখেছে সে। রাধিকা সংসারে নানা কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তার সঙ্গে গল্প করে। সে কী কী খেতে ভালোবাসে—কাঁকরোল ভাজা, বড়ি ভাজা, মোচা, মাছের মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল—সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়ে রেঁধে দেয়। তিন চার দিন 'বেগমপুর টকিজ'য়ে নিয়ে গিয়ে সিনেমাও দেখিয়ে এনেছে। নিশাপতি প্রায় সারাদিনই বাড়িতে থাকে না। সকালে বেরিয়ে যায়, ফিরতে ফিরতে সন্ধে। এসেই কমলার খোঁজখবর নেয়। তার কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি? নতুন জামাকাপড় কিনতে হবে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

শোকের তীব্রতা চিরকাল একরকম থাকে না। কমলারও থাকে নি। ধনঞ্জয়ের মৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তার কিছুটা হলেও মহামায়ারা পূরণ করে দিয়েছিল।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন একটা খালি স্ট্যাম্প পেপার কমলার হাতে দিয়ে নিশাপতি বলেছে, 'এখানে একটা সই করে দে তো মা—'

মহামায়া কোথায় ছিল, ছুটে চলে এসেছে। জিগ্যেস করেছে, 'কীসের সই রে?'

চমক লেগে গিয়েছিল নিশাপতির চোখেমুখে। বেশ বিরক্তই হয়েছিল সে। —'তুমি আবার এখানে কেন? যাও, যা করছিলে কর গে—'

মহামায়া কড়া ধাতের মেয়েমানুষ। বলেছে, 'আগে আমার কথার জবাব দে।'

নিরীহ, ভালমানুষের মতো মুখ করে এবার নিশাপতি বলেছে, 'পিসি, ওদের বাড়িঘর জমিজমা সব কিছু রয়েছে ধনঞ্জয়দা'র নামে। সে স্বর্গে গেছে। বিষয় সম্পত্তি কমলার নামে করে দিতে হবে তো। কোর্টে দরখাস্ত করতে হবে। সম্পত্তি ওর নামে করাতে হলে অনেক জায়গায় ছোটাছুটি করতে হবে। কমলার সই আর ওর বাবার মৃত্যুর ডাক্তারি সার্টিফিকেট ছাড়া কিছুই করা যাবে না। সমস্ত সরকারের গর্ভে ঢুকে যাবে।—তুমি চাও না, ওর বাপের জিনিস ও পায়?'

মহামায়া লেখাপড়া শেখে নি। অক্ষরপরিচয়হীন। কিন্তু বুদ্ধিটা খুবই প্রখর। নিজের ভাইপোটিকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। নিশাপতি হড়হড় করে যা বলে গেছে তার খানিকটা বুঝেছে, খানিকটা ধোঁয়াটে থেকে গেছে। একদৃষ্টে কয়েক লহমা তাকিয়ে থাকার পর বলেছিল, 'বাপ-মা মরা মেয়ে। ওর যেন কোনও ক্ষতি না হয়—'

নিশাপতি লম্বা জিভ কেটে বলেছে, 'ওর ক্ষতি হবে এমন কিছু কি করতে পারি? তুমি চিন্তা কোরো না পিসি।'

এরপর আরও ক'টা স্ট্যাম্প পেপারে কমলাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছিল নিশাপতি। কোনও বার বলেছে, মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে ধনঞ্জয়ের যে পাওনাগণ্ডা আছে, সেসব তুলে কমলার নামে ব্যাঙ্কে রাখবে। কোনও বার বলেছে, পোস্ট অফিসে ধনঞ্জয় যা টাকাপয়সা জমিয়ে রেখে গেছে সেই পাশ-বইয়ে তার নাম বদলে কমলার নাম তুলতে হবে। কেউ মারা গেলে, তার ছেলেমেয়ে বউ অর্থাৎ যে-সব ওয়ারিশান বেঁচে থাকে, বিষয় আশয়ের জন্য, টাকাকড়ির জন্য তাদের কত কিছু যে করতে হয়, কত

জায়গায় যে দৌড়তে হয়। তবে নিশাপতি যখন কমলায় দায়িত্ব নিয়েছে, তাকে এসব নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতে হবে না। যা করার নিশাপতিই করবে। বাপের যা যা আছে, মসৃণভাবে কমলার নামে হয়ে যাবে।

মাঝে মাঝে নিশাপতি বলত, 'শুনেছি তোর লেখাপড়ায় খুব মাথা। এবার উচ্চমাধ্যমিক দেবার কথা ছিল। তা কী করবি?'

বাবার মৃত্যু একেবারে ঝাঁকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল কমলাকে। লেখাপড়ায় মন বসাতে পারছিল না। বলেছে, 'এবারটা থাক। আসছে বছর দেব। আমার ক্লাস টুয়েলভের প্রি-টেস্ট অব্দি দেওয়া ছিল। স্কুলে গিয়ে হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করে খবর নেব, কী করতে হবে—'

'সে-ই ভাল। তবে একটা কথা মা—'

'কী?'

'ধনঞ্জয়দা বলে গিয়েছিল ভাল ছেলে পেলে যেন তোর বিয়ে দিই। বুঝতেই তো পারছিস, আমারও কম বয়েস হয়নি। মানুষের আয়ুর কথা কি বলা যায়? তেমন যদি পাই, বিয়েটা কিন্তু দিয়ে দেব। তখন না বলিস নি।'

মুখ নামিয়ে নিয়েছিল কমলা। উত্তর দেয়নি। কী-ই বা বলবে সে? এটা তো ঠিক, তার সামনেই ধনঞ্জয় নিশাপতিকে বিয়ের কথা বলেছিল। সে যদি যত তাড়াতাড়ি পারে তাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দায়মুক্ত হয়ে চায়, কমলা কী আর করতে পারে? মাথার ওপর মা-বাবা নেই, অন্যের বাড়িতে এসে আছে। তাদের ইচ্ছেমতোই তো চলতে হবে।

সপ্তাহ দুয়েক পর স্কুলে গিয়ে কমলা খবর নিয়েছিল, তাকে আর স্কুলের ক্লাস করতে হবে না। বাড়িতেই পড়াশোনা করুক, কোচিং ক্লাসে যাক। পরের বছর টেস্টে বসে ফ্রি জমা দিলেই পরীক্ষা দিতে পারবে।

সেইমতোই তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিল কমলা। কিন্তু দিন পনেরো আগে আচমকা এক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এল নিশাপতি। ছেলেটি বেশ সুপুরুষ, বি. এসসি পাশ, কম্পিউটারে কী একটা ডিগ্রি আছে। দিল্লিতে ভালো চাকরি করে। মাইনে বিশ হাজার। নাম দীপঙ্কর। সঙ্গে ওর মা, ছোট ভাই আর এক বন্ধুও এসেছিল। দেখে এবং কথাবার্তা বলে মনে হয়েছিল, খুবই ভদ্র। কমলার বেশ ভাল লেগে গিয়েছিল। দীপঙ্করদেরও তাকে ভীষণ পছন্দ হয়েছে। ওর মা সেদিনই জানিয়ে দিয়েছিল, এ বিয়েতে তারা রাজি।

এমনকি যে মহামায়া নিশাপতির সব ব্যাপারে খুঁত ধরে, কোনও কথাই প্রায় বিশ্বাস করতে চায় না, তার ধারণা নিশাপতি যা-ই করুক তার মধ্যে রয়েছে গোপন অভিসন্ধি, সে অব্দি দীপঙ্করকে দেখে বেজায় খুশি। নিশাপতিকে বলেছিল, 'অ্যাদ্দিনে একটা সত্যিকারের ভাল কাজ করেছিস রে নিশা। মা-বাপ মরা মেয়েটা সুখেই থাকবে বলে মনে হচ্ছে।'

হেসে হেসে নিশাপতি বলেছে, 'তুমি তো সবসময় আমাকে সন্দেহ কর। দেখলে তো, ভাল কাজও আমি করি। আমি লোকটা পুরোপুরি হাড়বজ্জাত নই।'

'তাই তো দেখছি।'

এরপর হইহই করে বিয়ের কেনাকাটা শুরু হয়ে যায়। সোনার গয়না ধনঞ্জয় আগেই তৈরি করিয়ে রেখেছিল। এবার নিশাপতি সোজা কলকাতা থেকে শাড়ি, বরের ধুতি পাঞ্জাবি, বাসনকোসন, সাজের জিনিস ইত্যাদি কিনে আনল। পুরুত, রাঁধুনে বামুন ঠিক করা হল। বাড়িতেই বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুন্দর করে উঠোনে প্যান্ডেল সাজানো হল।

বিয়ের দিন সন্ধেবেলায় বর এবং বরযাত্রীরা এসে পড়েছে। বাড়িরই একটা ঘর সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখানে তাদের যত্ন করে বসানো হল।

নিমন্ত্রিতরা একে একে আসতে শুরু করেছে। একটা ঘরে কমলাকে ঘিরে বসে আছে তার স্কুলের বন্ধুরা। তারাই তাকে সাজিয়েছে। বিয়ের লগ্ন আটটা নাগাদ। কিছুক্ষণের মধ্যে ওকে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাওয়া হবে। চলছে অবিরাম হাসি, মজার মজার কথা। বন্ধুরা সবাই একসঙ্গে কল কল করছে। সারা ঘর সরগরম।

হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরে এসে ঢুকেছিল মহামায়া। তাকে দেখে হুল্লোড় থেমে গেছে।

এই ঘরের দু'টো দরজা। সামনের দিকের দরজা দিয়ে বেরুলে চওড়া. উঁচু বারান্দা, তার ঠিক নিচেই উঠোন, যেখানে প্যান্ডেল খাটিয়ে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। অন্য দরজাটা দিয়ে বেরুলে বাড়ির পেছন দিকে যাওয়া যায়। সেখান রয়েছে ঝোপঝাড় আর আগাছা। তারপর বাড়ির সীমানা বরাবর কোমরসমান উঁচু শ্যাওলা-ধরা, ভাঙাচোরা পাঁচিল। পাঁচিলটার গায়ে কাঠের পলকা, নিচু দরজা। দিনরাত ওটা হাট করে খোলা থাকে।

কমলার বন্ধুদের বসতে বলে মহামায়া তাকে ডেকে নিয়ে বাড়ির পেছন দিকে চলে গেল। তার একটা হাত ধরে টানতে টানতে আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে খিড়কির খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে আসে।

ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল কমলা। সেই সঙ্গে অজানা কোনও ত্রাসে গলা শুকিয়ে গেছে তার। মহামায়া দূর সম্পর্কের ঠাকুমা হয়। সে জিগ্যেস করেছিল, 'কী হয়েছে? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তুমি?'

মহামায়া চাপা গলায় বলেছে, 'এখন টুঁ শব্দটি করবি না। মুখ বুজে চুপচাপ আমার সঙ্গে চল—'

বাড়ির বাইরে উঁচুনিচু একটা মাঠ। সেখানে রয়েছে নানা ধরনের ঝাড়ালো গাছ। তারপর থেকে শুরু হয়েছে একটানা ধানখেত।

মাঠের শেষ মাথায় একটা পাকুড় গাছের তলায় এসে মহামায়া দাঁড়িয়ে পড়েছিল। অগত্যা কমলাকেও থামতে হয়েছে। মহামায়া বলেছিল, 'এই বিয়ে হলে তোর সর্বনাশ হয়ে যাবে কমলা। নিশা যে এত বড় শয়তান, তার মাথায় যে এত প্যাঁচ, আগে বুঝতে পারিনি রে দিদি। এই খানিক আগে সেটা টের পেয়েছি। তক্ষুনি ঠিক করলাম তোকে বাঁচাতে হবে। ওই জানোয়ার নিশাটার মাথায় বজ্রাঘাত হোক—'

অন্ধকারে বিহ্বলের মতো মহামায়ার দিকে তাকিয়ে থাকে কমলা।

মহামায়া এবার সবিস্তার সব বুঝিয়ে দেয়। দীপঙ্কর, তার ভাই মা আর বন্ধুরা সবাই জালি লোক। এরা একটা দুষ্টচক্র তৈরি করেছে। দীপঙ্কর সুপুরুষ, কথাবার্তায় চমৎকার। তা ছাড়া জানানো হয় ও বড় চাকরি করে। দীপঙ্করকে দেখে মেয়েদের মা-বাপেরা মুগ্ধ হয়ে যায়। পাছে এমন সুপাত্র হাতছাড়া হয়, তাই চটপট মেয়েদের বিয়ে দিয়ে ফেলে।

আসলে এই বিয়ে হল একটা ফাঁদ। একবার শুভ কাজটি চুকে যাবার পর মেয়েটিকে নিয়ে তার কাজের জায়গায় যাবার নাম করে চলে যায় দীপঙ্কর। এরপর মেয়েটির আর হদিস পাওয়া যায় না। তাকে কোথায় যে উধাও করে দেওয়া হয়, কে জানে।

এইভাবে একের পর এক বিয়ে করে দীপঙ্কর আর তার টিমটা কত মেয়ে যে পাচার করেছে তার লেখাজোখা নেই। কীভাবে নিশাপতি এদের খোঁজ পেয়েছে, মহামায়া জানে না। তবে কিছুক্ষণ আগে খবর পেয়েছে, কমলাকে

বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে সে পঞ্চাশ হাজার টাকা দীপঙ্করদের কাছ থেকে আদায় করেছে। যে মেয়ের বয়স ষোলো থেকে কুড়ির ভেতর আর সে যদি সুন্দরী হয় তার দাম তত চড়া।

শুনতে শুনতে সারা শরীর থর থর করছিল কমলার। হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে জোরে লাফাছিল যেন বুকের ভেতরটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

মহামায়া বলেছিল, 'এখানে থাকলে তোকে আমি বাঁচাতে পারব না।'

দিশেহারা কমলা জিগ্যেস করেছিল, 'এখন আমি কী করব ঠাকুমা?'

মাঠের ওধারে ধানখেতের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মহামায়া বলেছে, 'ওখান দিয়ে পালিয়ে যা। আর দাঁড়াস না। তোকে না দেখলে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যাবে।'

এরপর আর একটা কথাও বলেনি কমলা। ঊর্ধ্বশ্বাসে ধানখেতে নেমে দৌড় শুরু করেছিল। কোথায় যাচ্ছে, গন্তব্য কোথায়, কিছুই তার জানা নেই। একটাই চিন্তা তার মাথায় তখন পাক খাচ্ছিল, যত তাড়াতাড়ি যত দূরে সম্ভব, তাকে পালাতে হবে। নিশাপতিদের নাগালের বাইরে।

কিন্তু সেটা যে পারা যায় নি, পরদিন সকালেই টের পেয়েছিল কমলা। বেগমপুরের মার্কামারা বন্দুকবাজ নাটা, গালপোড়া কেলো, হরা এবং আরও ক'জনকে তার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিল নিশাপতি। ওরা যাতে ধরতে না পারে, তাই কখনও কোনও পোড়ো বাড়িতে, কখনও কাল ভার্টের তলায় লুকিয়ে থেকেছে সে। কিন্তু শকুনের নজর তো। তাদের এড়ানো যায়নি। পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের শিকার কি এত সহজে হাতছাড়া করা যায়? ...

তার জীবনে যা যা ঘটেছে এবং এই দু'দিন কীভাবে কাটিয়েছে তার খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে থামল কমলা। একটানা কথা বলার কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। তা ছাড়া দু'টো দিন তার খাওয়াও হয়নি।

ক্ষুধার্ত, বিধ্বস্ত মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন দিবাকর। অপার সহানুভূতিতে তাঁর মন ভরে যাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর কমলা বলল, 'আপনারা না বাঁচালে নাটারা আমাকে ঠিক তুলে নিয়ে যেত।'

দিবাকর বললেন, 'তোমার পক্ষে আর বেগমপুরে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'নিশাপতি দাস একবার আমায় পেলে ছিঁড়ে খাবে। দীপঙ্কররা নিশ্চয়ই ওকে ছাড়ে নি। দাম হিসেবে যে টাকাটা দিয়েছিল, আদায় করে নিয়ে চলে গেছে। নিশাপতি কতখানি খেপে আছে, বুঝতেই পারছেন।'

'কিন্তু—'

'কী?' কমলা উদগ্রীব হল।

দিবাকর জিগ্যেস করেন, 'বেগমপুর ছাড়া আর কোথাও তোমাদের কোনও আত্মীয়স্বজন আছে যেখানে থাকলে তোমার ভয় নেই? যদি বল তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিতে পারি।'

'না না না—' জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নাড়তে থাকে কমলা।

দিবাকর অবাক।—'কী হল?'

কমলা জানায়, বেগমপুরের কাছাকাছি আর-একটা ছোট টাউন আছে। সেখানে তার মায়ের খুড়তুতো এক ভাই থাকে। দূর সম্পর্কের মাসি এক আর মেসো রয়েছে আরও দূরের এক শহরে। কিন্তু তাদের কাছে সে যাবে না।

মেয়েটার মনোভাব আঁচ করে নিলেন দিবাকর। নিশাপতি দাসের কাছ থেকে যে ধাক্কাটা সে খেয়েছে, তাতে মানুষ সম্পর্কেই তার বিশ্বাস পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে আত্মীয় পরিজনরা তার আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে।

দিবাকরের কপালে ভাঁজ পড়ে। তিনি খুবই চিন্তাগ্রস্ত। মেয়েটিকে উদ্ধার করে রীতিমতো সংকটেই পড়া গেল। বললেন, 'তা হলে কোথায় যেতে চাও?'

'জানি না।'

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন দিবাকর।

কমলা কয়েক লহমা ভেবে বলে, 'আপনারা যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যাব।'

দিবাকর হতবাক। বলে কী মেয়েটা! বেশ কিছুক্ষণ বাদে বললেন, 'কতটুকু সময় আমাদের দেখেছ? আমরা যে লোক ভাল বুঝলে কী করে?'

'যেটুকু দেখেছি তাতেই বুঝেছি। দয়া করে গাড়ি থেকে আমাকে নামিয়ে দেবেন না।'

মেয়েটা দু'হাতে তাঁদের আঁকড়ে ধরেছে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে এভাবে জড়িয়ে পড়তে হবে, কে ভেবেছিল। দিবাকর বললেন, 'আমরা হাসপাতালে থাকি। সেখানে—'

তাঁকে শেষ করতে দিল না কমলা।—'সেখানেই আমাকে নিয়ে চলুন।'

'আমরা ওখানকার পেশেন্ট। রুগি ছাড়া ওখানে কারওকে থাকতে দেওয়া হয় না।'

মেয়েটা তাঁর কথা কতটা বিশ্বাস করল সে-ই জানে। বলল, 'আপনি একটু চেষ্টা করলে আমার একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।'

এদিকে কমলা এবং তাকে ধাওয়া করে আসা বন্দুকবাজদের জন্য হাইওয়েতে সব গাড়ি জট পাকিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ফের সেগুলো চলতে শুরু করেছে। মণিময় এতক্ষণ তাঁদের অ্যামবাসাডরটাকে পাশের ঢালু ঘাসের জমির ওপর দিয়ে খুব সতর্কভাবে আস্তে আস্তে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এবার গাড়িটাকে ফের হাইওয়েতে তুলে আনলেন। অ্যামবাসাডর মসৃণ গতিতে দৌড় শুরু করে।

দিবাকর কমলাকে বললেন, 'যারা হাসপাতাল চালায় তারা কি পেশেন্টদের কথা শোনে?'

অপার নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে কমলা। উত্তর দেয় না। তার ঠোঁট দু'টো থরথর করতে থাকে।

দিবাকর এবার মণিময় আর শুভেন্দুর দিকে তাকান। জিগ্যেস করেন, 'মেয়েটির কথা তো তোমরা সবই শুনলে। বড় সমস্যায় পড়া গেল। একে নিয়ে কী করা যায় বলতে পার?'

হাতে স্টিয়ারিং নিয়ে পেছন ফেরা সম্ভব নয় মণিময়ের পক্ষে। সামনের রাস্তার দিকে চোখ রেখে সে বলে, 'বুঝতে পারছি না।'

শুভেন্দু অবশ্য ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল। সে-ও একই জবাব দিল।

কমলা হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে ওঠে।—'আমি আপনাদের ছাড়ব না। আমাকে রক্ষা করেছেন। জীবনে আর যেন কোনও বিপদে না পড়ি, সেই ব্যবস্থা আপনাদের করে দিতেই হবে।'

দিবাকর বললেন, 'দেখ মা, তুমি অনেকদিন বাঁচবে। কিন্তু আমাদের এই তিনজনের হাতে সময় খুব অল্প। মাত্র ছ'টা মাস। তোমার বাকি জীবনের জন্যে আমরা কী-ই বা করতে পারি?'

মাত্র ছ'মাস তাঁদের হাতে রয়েছে। এই কথার মানে কী? সমস্ত কিছু কেমন যেন গুলিয়ে যায় কমলার। বিমূঢ়ের মতো সে তাকিয়ে থাকে।

মণিময় বললেন, 'কাল সারা রাত মেলায় যাত্রা শুনে কাটিয়ে দিয়েছি। এক ফোঁটা ঘুম হয়নি। তারপর আজ সকাল থেকে প্রচুর হই হই করেছি। নার্ভগুলো এখন ছিঁড়ে পড়ছে। স্টিয়ারিং ধরে রাখতে পারছি না। হয়তো অ্যাকসিডেন্ট করে বসব।'

দিবাকরকে উদ্বিগ্ন দেখায়।—'তা হলে?'

মণিময় বলেন, 'দুরে, রাস্তার বাঁ দিকে অনেক আলো টালো দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ধাবা কি ওয়েসাইড হোটেল। গাড়িটা কি ওখানে নিয়ে যাব?'

'তা-ই চল। রাতটা ওখানে থাকতে পারলে ভাল রেস্ট হবে। তারপর ঠান্ডা মাথায় মেয়েটি সম্পর্কে কী করা যায় ঠিক করা যাবে। আমিও ভীষণ টায়ার্ড ফিল করছি।'

শুভেন্দু জানাল, সেও খুবই ক্লান্ত।

মণিময় কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দিবাকরদা, সেই হারামজাদাগুলো পিছু ছাড়ে নি। আমাদের ফলো করে আসছে।' ডান পাশের মিররে তিনি দেখতে পাচ্ছেন মোটর বাইকে তিন বন্দুকবাজ ধেয়ে আসছে। এর আগে হাইওয়ের গাড়িগুলো থেমে জট পাকিয়ে যাওয়ায় ওরা আটকে গিয়েছিল, মণিময়দের দিকে এগুতে পারেনি। কিন্তু আপ আর ডাউনের মাঝখানে রাস্তা এখন অনেকটা ফাঁকা। তাই বাইক চালাতে ওদের অসুবিধা হচ্ছে না।

বাইক আর অ্যামবাসাডরের মধ্যে দুরত্ব প্রায় পঁচিশ তিরিশ গজের মতো। বন্দুকবাজগুলোর-সব চেয়ে বেশি আক্রোশ দিবাকরের ওপর। তিনি ওদের গ্যাংয়ের দু'জনকে মেরে মুখ মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের মাথায় এখন গনগনে ক্রোধ। খুনেগুলো গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাতে চেঁচাতে সমানে উগরে দিচ্ছিল অকথ্য খিস্তি।—'শালা শুয়ারকা বাচ্চা শুড়ঢা, তোর কোন বাপ তোকে বাঁচায় দেখব। তোর—'

রাগে, অসহ্য উত্তেজনায় আচমকা রক্তচাপ একটা বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছে যায় দিবাকরের। দাঁতে দাঁত চেপে মণিময়কে বলেন, 'গাড়িটা থামাও। জানোয়ারগুলোকে টিট করে দিই।'

'না না না—' গভীর উৎকণ্ঠায় মণিময় বলেন, 'ওদের হাতে বন্দুক আছে। আমি গাড়ি থামাব না।'

সমস্যাটা যেন এবার বুঝতে পারেন দিবাকর। গাড়ি থেকে নামলেই ওরা গুলি চালিয়ে দেবে। অকারণ হঠকারিতার কোনও মানে হয় না। প্রবল হতাশায় বাঁ হাতের তালুতে একটা ঘুষি মেরে বলে ওঠেন, 'আমার লাইসেন্সড রিভলভারটা যদি সঙ্গে আনতাম, তিনটেকেই মাটিতে শুইয়ে দিতে পারতাম।' বলতে বলতে তাঁর চোখ এসে পড়ে কমলার ওপর। মেয়েটার মুখ একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেছে। ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে সে।

খুব আর্দ্র স্বরে দিবাকর বলেন, 'আমরা যতক্ষণ আছি তোমার গায়ে কেউ আঁচড় কাটতে পারবে না। ঘাবড়িও না।'

মোটর বাইকটা স্পিড তুলে কাছাকাছি আসতে চাইছে। মণিময়ও পাল্লা দিয়ে গতি বাড়িয়ে দিয়েছেন। মাঝখানের দূরত্বটা এক ইঞ্চিও কমেনি।

অনেকটা দূর থেকে যে ঝলমলে আলো দেখা যাচ্ছিল সেটা ধাবা।

একটা একতলা বাড়ির সামনের দিকে তেরপল খাটিয়ে চেয়ার টেবল পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা। একধারে তক্তপোশে পুরু গদি পাতা। তার ওপর কোলের কাছে ক্যাশবাক্স নিয়ে বসে আছে বিপুল চেহারার এক শিখ। নিশ্চয়ই এই ধাবার মালিক। তেরপলের ছাউনির তলায় এখন অনেকেই খেতে বসেছে। চেহারা দেখে আঁচ করা যায়, এরা ট্রাকের ড্রাইভার আর খালাসি।

খাওয়ার জায়গাটা বাদ দিলে দু'ধারে অনেকটা করে ফাঁকা চত্বর। সেখানে লাইন দিয়ে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে।

মণিময় তাঁদের গাড়িটাকে হাইওয়ে থেকে ধাবার ছাউনিটার কাছে এনে দাঁড় করান। তক্ষুনি দিবাকর কমলাকে সঙ্গে করে নেমে পড়েন। তার হাত ধরে দৌড়তে দৌড়তে তক্তপোশের গদিতে যে প্রকাণ্ড চেহারার শিখটি বসে ছিল তার কাছে চলে আসেন।

শিখটি অবাক হয়ে গিয়েছিল। —'ক্যা হুয়া বাবুসাহেব?'

যারা খাচ্ছিল, তারাও কম অবাক হয়নি। মাটি ফুঁড়ে কোত্থেকে একটা অ্যাম্বাসাডার এসে হাজির হল, একজন বয়স্ক লোক যাকে দেখলে রীতিমতো সমীহ হয়, গাড়ি থেকে নেমে একটি সুন্দরী যুবতীকে কেন

টানতে টানতে উর্ধ্বশ্বাসে সোজা ধাবার মালিকের কাছে চলে গেল, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। অনন্ত বিস্ময়ে তারা তাকিয়ে থাকে।

কমলাকে নিয়ে রাস্তায় যা যা ঘটেছে খুব সংক্ষেপে তা জানিয়ে দেন দিবাকর। মোটরবাইকের বন্দুকবাজরা ধাবার চৌহদ্দিতে ঢোকেনি। একটু দূরে বাইকটা থামিয়ে নিচে নেমে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিবাকর বললেন, 'ওই বদমাশগুলো মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। আপনি আমাদের মদত করুন সর্দারজি। নইলে একে বাঁচাতে পারব না।'

শিখ জাতটা এমনিতেই সামরিক। ধাবা চালালেও এই সর্দারজিটির ক্ষাত্র তেজ একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। তাছাড়া একজন মাঝবয়সি সম্ভ্রান্ত মানুষ একটি যুবতীকে রক্ষা করার জন্য তার সাহায্য চাইছেন। সে মোচড় দিয়ে নিজের বিশাল শরীরটাকে লহমায় টেনে তোলে। তারপর বাইকটা দেখিয়ে যারা খেতে বসেছিল তাদের বলে, 'ওহি তিন শুয়ারকা আউলাদ লেড়কি ছিনকে লেনে আয়া। মার মারকে উসলোগকো হাড্ডি তোড় দো—'

ড্রাইভার আর খালাসিরা খাওয়া ফেলে চকিতে উঠে পড়ে। একটা মেয়েকে বজ্জাতদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে—এর চেয়ে বড় কাজ আর কী হতে পারে! হাতের সামনে যে যা পায়, লাঠি, লোহার ডান্ডা নিয়ে রে রে করতে করতে তেড়ে যায়। ধাবার ফাঁকা জায়গার একধারে খোয়া ডাঁই হয়ে পড়ে ছিল। কেউ কেউ খোয়াও তুলে নিয়েছে।

কমলাকে সর্দারজির কাছে গদিতে বসিয়ে দিবাকরও বিশাল বাহিনীর সঙ্গে পা মিলিয়েছেন। মণিময় আর শুভেন্দু এর ভেতর গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল। তারাও ড্রাইভার খালাসিদের সঙ্গে দৌড় শুরু করেছে।

বেগতিক বুঝে বন্দুকবাজরা বাইকে উঠে পড়েছিল। এদিকে ড্রাইভার খালাসিদের হিংস্র বাহিনীটা খোয়া ছুড়তে ছুড়তে তুমুল চিৎকার করছিল, 'কুত্তে, হারামখোর, তোদের জানে খতম করে দেব।'

বন্দুকবাজরা বুঝতে পারছিল, আর এখানে থাকা ঠিক নয়। যে মারমুখী জনতা ধেয়ে আসছে তারা চোখের পাতা পড়তে না পড়তে তাদের লাশ বানিয়ে ফেলবে। কাজেই জান বাঁচাতে হলে কিন্তু তার আগে একটা কামড় বসাতেই হবে।

বন্দুকবাজদের যাবতীয় আক্রোশ দিবাকরের ওপর। একজন বাইকে স্টার্ট দিয়েছিল। বাকি দু'জন তার পেছনে বসে দিবাকরের দিকে বন্দুক তাক করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। বেশির ভাগই তাঁর মাথার ওপর দিয়ে বা পাশ দিয়ে পেরিয়ে যায়। কিন্তু একটা এসে লাগে পেটের ডান দিকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান তিনি। গলগল করে রক্তের স্রোত বেরিয়ে আসতে থাকে।

টার্গেটে গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে বাইকটা হাইওয়ে দিয়ে নিমেষে উধাও হয়ে যায়। অকথ্য গালাগাল করতে করতে উত্তেজিত ড্রাইভার আর খালাসিরা তাদের তাড়া করে গিয়েছিল। কিন্তু দৌড়ে গিয়ে বন্দুকবাজগুলোর নাগাল পাওয়া কি সম্ভব?

দু'হাতে পেট চেপে ধরে তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন দিবাকর। সর্দারজি দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল। সে দৌড়ে আসে। মণিময়দের বলে, 'বাবুসাহেবকে ধরুন। ঘরে নিয়ে যাই। বহুৎ খুন নিকলাচ্ছে।'

ধাবার একতলা বাড়িটায় অনেকগুলো ঘর। সর্দারজি, মণিময়, শুভেন্দু এবং আরও দু-একজন ধরাধরি করে দিবাকরকে একটা ঘরে নিয়ে খাটিয়ায় শুইয়ে দেয়।

সবার সঙ্গে কমলাও চলে এসেছিল। এক কোণে বসে দুই হাঁটুর মাঝখানে মুখ গুঁজে অঝোরে কেঁদে চলেছে সে। আর কান্না জড়ানো, ভাঙা গলায় বলে যাচ্ছে, 'আমার জন্যে ওনার প্রাণটা যেতে বসেছে। কী যে আমি করব!'

মণিময় বললেন, 'সর্দারজি, এখনই একজন ডাক্তার দরকার। যেভাবে রক্ত বেরিয়ে আসছে, ওটা বন্ধ না করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

সর্দারজি বলল, 'বাবুজি, হঁিহা কোই ডগদর মিলবে না। নজদিগ এক ছোটা টৌনে ডগদর দাসকে পাবেন। আপনাদের তো গাড়ি আছে। আমি আমার একঠো আদমি দিচ্ছি। সে ডগদরসাহেবকে চেনে। তাকে নিয়ে যান।'

মিনিট কুড়ির ভেতর মণিময় ডাক্তার দাসকে সঙ্গে করে ফিরে এলেন। ডাক্তারের বয়স বেশি নয়, চল্লিশের নিচেই। বেশ স্মার্ট চেহারা।

প্রচুর রক্তপাতে দিবাকর নির্জীব হয়ে পড়েছিলেন। তবে জ্ঞান আছে।

পরীক্ষা-টরীক্ষা করে ডাক্তার দাস মণিময়কে বললেন, মনে হচ্ছে, বুলেট পেটের ভেতর আটকে আছে। ইমিডিয়েট অপারেশন দরকার। আমি ইঞ্জেকশন দিয়ে ব্লিডিংটা যতটা সম্ভব বন্ধ করার চেষ্টা করছি। আপনারা এক্ষুনি এঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান।'

মণিময় জিগ্যেস করেন, 'এখানে কোথায় হাসপাতাল, কিছুই জানি না। আপনি আমদের হেল্প করুন—'

ডাক্তার দাস বললেন, 'আমাকে যে শহর থেকে নিয়ে এলেন সেখানে একটা হেলথ সেন্টার আছে। অপারেশন টপারেশন হয় না। আপনাদের কলকাতায় যেতে হবে।'

ডাক্তার দাস ইঞ্জেকশন দিয়ে এবং একটা ট্যাবলেট খাইয়ে, প্রেসক্রিপশন লিখে ফিজ নিয়ে চলে গেলেন।

মণিময় এবং শুভেন্দু দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। কী করবেন ঠিক করে উঠতে পারছেন না।

চোখ বুজে আসছিল দিবাকরের। দুর্বল, ক্ষীণ গলায় বললেন, 'এক কাজ করো মণিময়, লাইফলাইন ক্যানসার হাসপাতালের ডাক্তার অ্যান্টনিকে মোবাইল ফোনে ধরে আমাকে দাও।'

মণিময় বিমূঢ়ের মতো বললেন, 'আমরা ধরা পড়ে যাব যে—'

'এখন ধরা দিতেই হবে। আমার সময় আর নেই। তাড়াতাড়ি ফোনটা করো।'

মণিময় ডাক্তার অ্যান্টনিকে একবারেই পেয়ে গেলেন। ফোনটা দিবাকরকে দিয়ে বললেন, 'কথা বলুন—'

দিবাকর বললেন, 'গুড ইভনিং ডক্টর অ্যান্টনি স্যার—'

ডাক্তার অ্যান্টনি ধীর, স্থির মানুষ। কোনও কারণেই খুব একটা উচ্ছ্বসিত বা বিচলিত হয়ে পড়েন না। তিনিই কিন্তু এখন ভীষণ উত্তেজিত। 'কী ব্যাপার কর্নেল লাহিড়ি, হসপিটালে না জানিয়ে হঠাৎ চলে গেছেন। দুটো দিন আমরা কী টেনশনে যে রয়েছি! পুলিশে খবর দিয়েছি। তারাও খোঁজাখুঁজি করে আপনাদের পাচ্ছে না। এসবের মানে কী?'

'স্যার, এত প্রশ্নের উত্তর দেবার শক্তি আমার নেই। আই অ্যাম সিরিয়াসলি উন্ডেড। পেটে বুলেট লেগেছে।'

'বুলেট!' গলার স্বর শুনে বোঝা যায় ডাক্তার অ্যান্টনি আঁতকে উঠেছেন। 'কীভাবে লাগল!'

'পরে শুনবেন। এখন দয়া করে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। প্রচুর ব্লিডিং হয়েছে। এখনও হচ্ছে। লোকাল একজন ডাক্তার বলেছেন, ইমিডিয়েটলি অপারেশন করে বুলেট রিমুভ করা দরকার।'

'আপনি কোথায় আছেন?'

সর্দারজির কাছে নামটা জেনে নিয়ে দিবাকর বললেন, 'রাজানগর বলে একটা জায়গায়। হাইওয়ের ওপরে কর্তার সিংয়ের ধাবায়।'

ডাক্তার অ্যান্টনি বললেন, 'আমি এক্ষুনি সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি।'

মাথার ভেতর চিন্তার অবিরল প্রক্রিয়া চলছিল। ফোনটা অফ করে মণিময়কে একটা নাম্বার দিয়ে দিবাকর বললেন, 'এখানে মিস্টার অসিতাভ ঘোষকে ধরে আমাকে দাও—' অসিতাভ ঘোষ নামকরা সলিসিটরস ফার্ম 'ঘোষ, বোস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস'-এর সিনিয়র পার্টনার। এঁদের দিয়েই উইল করিয়েছিলেন তিনি।

অসিতাভ ঘোষকে পাওয়া গেলে দিবাকর বললেন, 'ঘোষসাহেব, আমার উইলটা একটু বদলাব। আপনি যেভাবে হোক স্ট্যাম্প পেপার টেপার নিয়ে 'লাইফলাইন ক্যানসার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার'-এ কাল দুপুর বারোটার ভেতর অবশ্যই চলে আসবেন।'

'কালকেই যেতে হবে!' রীতিমতো অবাক হলেন অসিতাভ।

'হ্যাঁ, কালকেই। আর ওই বারোটার মধ্যে।' পেটে বুলেট লাগার কথা জানিয়ে দিবাকর বললেন, 'আমার উইলটা সামান্য বদলাতে হবে। দেরি করলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। আশা করি কাল দেখা হবে। ছাড়ছি।'

নয়

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ডাক্তার অ্যান্টনি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ধাবায় চলে এলেন। তাঁর সঙ্গে 'লাইফলাইন'-এরই ডাক্তার জোশেফও এসেছেন। ওঁরা এসেছেন একটা মারুতি ওমনিতে। অ্যাম্বুলেন্সের ভ্যানে রয়েছে হাসপাতালের ক্লাস ফোর স্টাফের চারজন।

দিবাকরকে পরীক্ষা করে মুখ গম্ভীর হয়ে গেল ডাক্তার অ্যান্টনির। বললেন, 'লোকাল ডাক্তার ঠিকই বলেছেন, পেট থেকে বুলেটটা বার করতেই হবে। হাসপাতালে ফিরেই অপারেশনটা করতে হবে।'

দিবাকর বললেন, 'ডাক্তার অ্যান্টনি স্যার, দয়া করে কাল দুপুর বারোটার পর আমাকে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকাবেন।'

'এত দেরি তো করা যাবে না।'

'করতেই হবে। কাল কলকাতা থেকে আমার সলিসিটর আসছেন দুপুরে। পুরনো উইল বদলে নতুন উইল করতে হবে। ততক্ষণ আপনি আমাকে যেভাবে হোক বাঁচিয়ে রাখুন।'

দিবাকরের কথাগুলো মনঃপুত হল না ডাক্তার অ্যান্টনির, সেটা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল। তবু রাজি হলেন, 'ঠিক আছে, আপনার যখন তেমনই ইচ্ছে, তা-ই হবে।' এখন বলুন কে আপনাকে গুলি করেছে।'

দিবাকর বললেন, 'স্যার, কথা বলতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। মণিময় আপনাকে সব জানাবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই দিবাকরকে স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল। ঠিক হয়েছে, দু'ঘণ্টার জার্নিতে ঝাঁকুনি লেগে রক্তপাত যদি বেড়ে যায়, সেজন্য ডাক্তার জোশেফ তাঁর পাশে বসে যাবেন।

ডাক্তার অ্যান্টনি যে মারুতি ওমনিটা নিয়ে এসেছেন সেটায় তিনি ছাড়া যাবেন মণিময় এবং কমলা। তাছাড়া ড্রাইভার তো রয়েছেই। আর যে গাড়িটা নিয়ে দিবাকররা পাঁচদিনের লম্বা সফরে বেরিয়েছিলেন সেই নীল অ্যাম্বাসাডারটা ড্রাইভ করে নিয়ে যাবে শুভেন্দু।

এক সময় হাইওয়ে দিয়ে তিনটে গাড়ি পরপর চলতে শুরু করে। প্রথমে অ্যাম্বুলেন্স, সেটার পেছনে অ্যাম্বাসাডার, সবার শেষে মারুতি ওমনি।

ডাক্তার অ্যান্টনি মণিময়কে জিগ্যেস করলেন, 'এবার বলুন এমন একটা মারাত্মক ঘটনা কী করে ঘটল?'

কমলাকে দেখিয়ে মণিময় বললেন, 'এই মেয়েটির জন্যে।'

হতভম্বের মতো কয়েক পলক তাকিয়ে থাকেন ডাক্তার অ্যান্টনি। তারপর বলেন, 'বুঝতে পারলাম না।'

'ও কমলা।' নামটা জানিয়ে কাল এবং আজ রাস্তায় যা যা ঘটেছে তার সবিস্তার বিবরণ দিয়ে গেলেন মণিময়।

ডাক্তার অ্যান্টনি ভারী গলায় বললেন, 'কর্নেল লাহিড়ি ইজ আ গ্রেট সোল। আপনি আর শুভেন্দু বসুও মহৎ মানুষ।'

মণিময় বললেন, 'যা করার দিবাকরদাই করেছেন। আমরা সঙ্গে ছিলাম, এই পর্যন্ত। ওঁর মতো মানুষ হয় না।'

ডাক্তার অ্যান্টনি এবার কমলার দিকে মুখ ফেরান। তার মাথায় একটা হাত রেখে বিষাদ মাখানো সুরে বলেন, 'পুওর চাইল্ড। তোমার ভাগ্য ভাল, কর্নেল লাহিড়ির মতো একজন মানুষ তোমাকে দেখতে পেয়েছিলেন। নইলে কী যে হত, ভাবতেও সাহস হয় না। গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড।'

হাসপাতালে পৌঁছে জেনারেল ওয়ার্ডে নিয়ে বেডে শুইয়ে দেওয়া হল দিবাকরকে। বাকি রাতটা ডাক্তার অ্যান্টনি তাঁর কাছেই থাকবেন। যতটা সম্ভব ওষুধ বা ইঞ্জেকশন দিয়ে তাঁর কষ্টটা লাঘব করার চেষ্টা করবেন।

দিবাকর বললেন, 'কাল আমার সলিসিটর এলে তাঁকে দয়া করে এখানে আসতে দেবেন স্যার। ডাক্তার জোশেফ, ডাক্তার স্মিথ আর আপনাকেও তখন থাকতে হবে। আর থাকবে মণিময়, কমলা আর শুভেন্দু।'

ডাক্তার অ্যান্টনি বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যা চাইছেন তা-ই হবে।'

পরদিন দুপুরে বারোটার আগে আগেই 'লাইফলাইন ক্যানসার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার'-এ পৌঁছে গেলেন সলিসিটর অসিতাভ ঘোষ এবং তাঁর একজন জুনিয়র হিমানীশ মজুমদার।

আগের দিন রাত্তিরে দিবাকর যাদের তাঁর কাছে আসতে বলেছিলেন ডাক্তার অ্যান্টনি তাঁদের সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। দিবাকরের বেডটাকে ঘিরে ক'টা চেয়ার এনে সবাইকে বসানো হল।

দিবাকর আরও নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। হাতজোড় করে নির্জীব গলায় অ্যান্টনিকে বললেন, 'স্যার, আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। সেটা রাখতে হবে। অনুগ্রহ করে 'না' বলবেন না।'

ডাক্তার অ্যান্টনি বললেন, 'যদি আমার পক্ষে সম্ভব না হয়, আগে থেকে কী করে কথা দিই?'

'অসম্ভব হলে আপনাকে বলতাম না।'

'তাহলে শোনা যাক—'

একটু চুপচাপ।

তারপর দিবাকর বললেন, 'স্যার, আপনি বলেছিলেন, আমার আয়ু আর মোটে ছ'মাস। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হচ্ছে, দু-তিন দিনের বেশি নয়। তাই আপনাকে একটা দায়িত্ব দিয়ে যেতে চাই!'

'কীসের দায়িত্ব?'

কমলার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিবাকর বলেন, 'এই মেয়েটির। আপনি মণিময়ের মুখে এর সম্পর্কে কাল সবই শুনেছেন। আপনি শেলটার আর প্রোটেকশনের ব্যবস্থা না করলে শকুনের পাল একে ছিঁড়ে খাবে।'

তক্ষুনি উত্তর দেন না ডাক্তার অ্যান্টনি। নীরবে ভাবতে থাকেন।

দিবাকর বললেন, 'আপনাদের যে মিশন এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের কোনও আর্থিক দায় নিতে হবে না। সে বন্দোবস্ত আমি করে যাব। সেই কারণেই আমার সলিসিটরকে ডাকিয়ে এনেছি। আপনারা শুধু ওকে রক্ষা করবেন। জীবনে যাতে সসম্মানে বেঁচে থাকে, আপনাদের এত বড় হাসপাতাল, রিসার্চ সেন্টার, কোথাও একটা কাজে লাগিয়ে দিলে ও আনন্দে থাকবে।'

ডাক্তার স্মিথ এতক্ষণ একটি কথাও বলেননি। নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিলেন। এবার ডাক্তার অ্যান্টনির সঙ্গে নিচু গলায় পরামর্শ করে বললেন, 'ঠিক আছে, কমলা আমাদের এখানেই থাকবে।'

'ডাক্তার স্মিথ, ডাক্তার অ্যান্টনি, আমার মাথা থেকে একটা ভার নেমে গেল।' দিবাকর বলতে লাগলেন, 'কী যে শান্তি! ঈশ্বর আপনাদের ভালো করবেন।'

ডাক্তার স্মিথ এবং ডাক্তার অ্যান্টনি মৃদু হাসলেন।

দিবাকর বললেন, 'এবার অন্য কাজটা সেরে ফেলা যাক।' তিনি সলিসিটরের দিকে তাকালেন, 'মিস্টার ঘোষ, আগের উইলটা বদলানোর ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আগেই কথা হয়েছে। আমি যাদের নামে কিছু কিছু টাকা দিয়েছি আমার মৃত্যুর পর তারা সেই টাকাই পাবে। তবে চারটে মিশন আর দুটো ইউনিভার্সিটিকে যত অ্যামাউন্ট দিয়েছি তার অর্ধেক করতে হবে। এতে যে টাকাটা হাতে থাকবে তার ফিফটি পারসেন্ট পাবে কমলা, আর যে মিশন 'লাইফলাইন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার' চালায় তারা পাবে বাকি ফিফটি পারসেন্ট। সেইমতো সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট আজই করুন। স্ট্যাম্প পেপারে আমি সই করে দিচ্ছি। এখানে যাঁরা আছেন, সাক্ষী হিসেবে তাঁদের সইও করিয়ে নিন। পরে বয়ানটা এঁদের একবার দেখিয়ে নেবেন। তারপর কাল পরশুর ভেতর উইলটা রেজিস্ট্রি করিয়ে নেবেন।'

অসিতাভ ঘোষের নির্দেশে তাঁর জুনিয়র দিবাকরের বক্তব্য টুকে নিয়েছেন। সই-সাবুদও হয়ে গেছে।

দিবাকর এবার ডাক্তার অ্যান্টনির দিকে তাকান। 'স্যার, আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে অনেকটা সময় দিয়েছেন। এখন নিশ্চয়ই আমাকে অপারেশন থিয়েটারে যেতে হবে, তা-ই তো?'

ডাক্তার অ্যান্টনি অবাক বিস্ময়ে বিচিত্র মানুষটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আস্তে মাথা নাড়লেন শুধু।

দিবাকর হাসলেন। 'আমি প্রস্তুত।'